

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হয়েছিল :  
ইয়া রাসূলুল্লাহ্! শ্রেষ্ঠ মুমিন কে? তিনি বলেছেন, “যার চরিত্র সবচেয়ে  
উন্নত।”

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা  
লোকদেরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করো না বরং তোমাদের সদ্ব্যবহার ও উন্নত  
চরিত্র দ্বারা বশীভূত কর।”

তিনি আরও বলেছেন : “সিকিা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, নিকৃষ্ট  
চরিত্রও তেমনি আমলকে বরবাদ করে দেয়।”

হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন, হযরত নবী করীম  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর  
আকৃতি দান করেছেন, অতএব তুমি তোমার চরিত্রকেও সুন্দর কর।”

হযরত বারাহ ইবনে আযেব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দো'আ করতেন :

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

“হে আল্লাহ্! আপনি আমার আকৃতিকে যেমন সুন্দর করেছেন, আমার  
চরিত্রকেও তেমনি সুন্দর করে দিন।”

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এ দো'আ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَحَسَنَ الْخُلُقِ

“হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে স্বাস্থ্য, শান্তি এবং উন্নত চরিত্র  
প্রার্থনা করি।”

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

كَرَّمَ الْمُؤْمِنَ دِينَهُ وَحَسَبَهُ حَسَنَ الْخُلُقِ وَمُرُوءَتَهُ عَقْلَهُ

“মুমিনের মর্যাদা হচ্ছে তার দীন, আভিজাত্য হচ্ছে তার উন্নত চরিত্র,  
আর মনুষ্যত্ব হচ্ছে তার বুদ্ধি-বিবেক।”

হযরত উসামাহ ইবনে শারীক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন : একদা আমি  
লক্ষ্য করেছি যে, হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট  
একজন মরুচারী বেদুঈন লোক জিজ্ঞাসা করছে : শ্রেষ্ঠতম নেক গুণ যা  
বান্দাকে দেওয়া হয়েছে তা কোনটি? তিনি বলেছেন : “সুন্দর চরিত্র।”

হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ  
করেছেন :

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ

اخْلَاقًا

“কিয়ামতের দিন আমার সবাপেক্ষা প্রিয় এবং সবাপেক্ষা নিকটতর  
আসনের অধিকারী হবে এসব লোক যাদের চরিত্র সুন্দর।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَلَا تَعْتَدُوا بِشَيْءٍ  
مِّنْ عَمَلِهِ تَقْوَى تَحْجِزُهُ عَن مَّعَاصِي اللَّهِ وَحِلْمٌ يَكْفُ  
بِهِ السَّفِيَةَ أَوْ خُلُقٌ يَعْيشُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ

“তিনটি গুণ যার মধ্যে নাই অথবা (অন্ততঃ পক্ষে) একটি গুণও নাই  
তার আমলের কোনই মূল্য নাই : এক, আল্লাহভীতি, যা তাকে আল্লাহর  
অবাধ্যতা হতে বিরত রাখবে। দুই, ধৈর্য ও পরিণামদর্শিতা, যা তাকে  
জাহালত ও মুখতাশুলভ আচরণ থেকে বিরত রাখবে। তিন, সদ্ব্যবহার ও  
উন্নত চরিত্র, যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে বসবাস করবে।”

বর্ণিত আছে, নামায আরম্ভ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এ দো'আ পড়তেন :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَ

اصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

“আয় আল্লাহ্! আমাকে সুন্দর চরিত্রের পথ প্রদর্শন করুন, সেদিকে আপনি ছাড়া আর কেউ পথ-প্রদর্শন করতে পারে না। আয় আল্লাহ্! নিকৃষ্ট চরিত্র আমা থেকে দূরীভূত করে দিন, আপনি ছাড়া আর কেউ তা দূরীভূত করতে পারে না।”

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : কিসে সৌন্দর্য লাভ হয়? তিনি বলেছেন, নম্র কথনে, মুক্তমন ও সহাস্য আচরণে। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সুন্দর আখলাক ও উন্নত চরিত্রের আচরণ করবে, পরিচিত-অপরিচিত সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে; তাকে ভালবাসবে ও প্রশংসা করবে।

জনৈক জ্ঞান-বুদ্ধের উপদেশ হচ্ছে : “সংগুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের যাবতীয় দিক যদি তোমার ভিতর-বাহিরে সন্নিবেশিত করতে পার; সর্বশ্রেণীর লোকের সাথে তোমার আচার-আচরণ যদি সুন্দর হয়, তাহলে আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে প্রভুত কল্যাণ দান করবেন, সেই সঙ্গে দুনিয়ার মানুষও তোমার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবে।

.....

অধ্যা

হাস্য, ক্র

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন

وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

“তবে কি তোমরা এই কথায় নি-  
না, আর তোমরা অহংকার করে  
অর্থাৎ তোমরা এই কুরআনের  
অবিশ্বাস করছো, অথচ এ পবিত্র  
প্রেরিত। তোমরা কুরআন পাকের  
সত্য ও বাস্তব সত্যকবানী রয়েছে হে  
না; তোমাদের প্রতি কুরআনের  
গাফেল, অনামনস্ক।

বর্ণিত আছে, উক্ত আয়াত =  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও  
হাসতেন।

এক রেওয়াজাতে এমনও বর্ণিত  
পর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
মুচকি হাসতেও দেখা যায় নাই;  
মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণ  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থে  
বলছে আর মুখভরে হাসছে। এ ত

প্রতিবেশীকে জ্বালাতন করে। হযর বললেন : “সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।”

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ জ্ঞাপন করলে তিনি বললেন : ছবর কর। অতঃপর আরও দুবার এমনি হলো। চতুর্থবার হযর বললেন : তুমি তোমার বিছানাপত্র রাস্তায় ফেলে রাখ। লোকটি তাই করলো। এবার যেকোন পথচারী লোকটির এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে—লোকটির এই দশা কেন? কারণ জানতে পেরে লোকেরা বলতে লাগলো—জালেম প্রতিবেশীর উপর আল্লাহর লানত। এ কথা প্রতিবেশীর গোচরীভূত হওয়ার পর সে এসে লোকটিকে অনুরোধ স্বরে বলতে লাগলো—ভাই, তুমি তোমার বিছানা-পত্র স্বস্থানে নিয়ে নাও ; আমি আর কোনদিন তোমার সাথে অসদাচরণ করবো না।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ করলে তিনি বললেন : “মসজিদের দরজায় এ কথা লিখে দাও : “ওহে লোকসকল ! আশ-পাশের চল্লিশ বাড়ীর লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশী।” ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন : চতুর্দিকের প্রত্যেক দিকে চল্লিশটি করে বাড়ী বুনানো হয়েছে। হযর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : স্ত্রীলোক, বাড়ী এবং ঘোড়া এই তিনের মাঝে শুভ এবং অশুভ দুটিই রয়েছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে শুভ হচ্ছে, তার মহর কম হওয়া, সহজে বিবাহ হয়ে যাওয়া এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের হওয়া। এর অশুভ দিক হচ্ছে, মহর বেশী হওয়া, সহজে বিবাহ না হওয়া এবং দুশ্চরিত্রা হওয়া।

বাড়ীর ব্যাপারে শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, বাড়ী প্রশস্ত হওয়া, প্রতিবেশী সং হওয়া। আর অশুভ দিক হচ্ছে, বাড়ী সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী অসং হওয়া।

ঘোড়ার শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, মালিকের বশীভূত হয়ে থাকা এবং ঘোড়ার মধ্যে কোনরূপ কুঅভ্যাস না থাকা। আর অশুভ ও মন্দ দিক হচ্ছে, মালিকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হওয়া এবং কুঅভ্যাস থাকা।

এ কথাও অতি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাড়া-প্রতিবেশীর

দায়িত্ব শুধু এতটুকুই নয় যে, সে কাউকে কষ্ট দিবে না ; বরং অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হলে তা সহ্য করাও প্রতিবেশীর দায়িত্ব। কেননা, প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার সাথে সন্যবহার তখনই প্রতিফলিত হবে যখন তার কর্তৃক প্রদত্ত কষ্টে ছবর করা হবে ; কেবল কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম প্রতিবেশীর হক-আদায় নয়। অধিকন্তু প্রতিবেশীর সাথে বিনয় ও বিনম্র স্বভাব অবলম্বন করবে, তার প্রতি অনুকম্পা-অনুগ্রহ করবে— এটা জরুরী। বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন দরিদ্র প্রতিবেশী ধনী প্রতিবেশীর আচল ধরে ফেলবে এবং অভিযোগ করবে— আয় রব! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন তার ধন-সম্পদ থেকে আমাকে দান করা হতে বিরত রয়েছে, কেন সে আমা থেকে তার দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

একদা হযরত ইবনে মুকাফ্ফা জানতে পেলেন যে, ঋণ পরিশোধের জন্য তার প্রতিবেশী বাড়ী বিক্রি করে দিচ্ছে। তিনি তাকে তা বিক্রি করতে বারণ করলেন এবং পরিমিত টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য হাদিয়া করে দিলেন।

এক বুয়ুর্গ তাঁর বাড়ীতে ইদুরের উৎপাতের কথা উল্লেখ করলে এক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়ে বললো : আপনি বিড়াল পোষলে সমস্যা থাকবে না। তিনি বললেন : এতে খুবই আশংকা রয়েছে যে, বিড়ালের ডাক শুনে ইদুর ভয়ে আমার বাড়ী ছেড়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নিবে। আমি নিজের জন্য এক্সপ হওয়াটা পছন্দ করি না, তাই আমার প্রতিবেশীর জন্যে এটা কেন পছন্দ করবো? সুতরাং এ হতে পারে না।”

মোটকথা, পাড়া-প্রতিবেশীর যেসব হক ও অধিকার রয়েছে, তা মোটামুটিভাবে (সংক্ষেপে) এই যে, সাক্ষাতে তুমি আগে তাকে সালাম দিবে, অথবা আলাপ দীর্ঘ করবে না, বেশী বেশী প্রশ্নের অবতারণা করবে না, অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, মসীবতে তাকে সাহায্য দিবে, শোক-দুঃখে তাকে সঙ্গ দিবে, তার আনন্দে তুমিও আনন্দ প্রকাশ করবে ; তাকে অভিনন্দিত করবে, তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবে, তার বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে তাকাবে না ; তার গোপনীয়তা নষ্ট করবে না, তার বাড়ীর দেওয়ালে কোন পশু-ছানা বা অন্য কোন বস্তু রেখে তাকে বিরক্ত করবে না, তার সীমানাস্থিত ড্রেন বা প্রণালীতে পানি প্রবাহিত করবে না, তার আঙ্গিনায়

ধূলি-বালি বা মাটি নিক্ষেপ করবে না, তার গৃহে প্রবেশের রাস্তা সংকর্ণ করবে না, ঘরে কিছু নিয়ে যেতে থাকলে সৈদিকে দৃষ্টিপাত করবে না, তার কোন গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেলে তা গোপন করে রাখবে ; প্রচার করবে না, আপদ-বিপদে তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীর প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টি রাখবে, তার বিরুদ্ধে কোন কথায় কণ্ঠপাত করবে না, তার ইযত-সম্মত রক্ষায় তৎপর থাকবে, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখবে, পরিচারিকার প্রতি তাকাবে না, তার শিশু-সন্তানদের সাথে সবিনয় মিষ্ট-মধুর আচরণ করবে, দ্বীন বিষয়ে অজ্ঞ হলে মহব্বতের সাথে তাকে সং-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে, এমনিভাবে পার্শ্ব বিষয়েও তাকে সুপারামর্শ প্রদান করবে। এ হচ্ছে সাধারণ পাজি-প্রতিবেশীর মোটামুটি হকসমূহ।

হযর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “তোমরা কি জান প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি? সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, তার সহযোগিতায় শরীক হবে, সে তোমার কাছে ঋণ চাইলে ঋণ দিবে, সে অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে, সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, তার মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হবে ; জানাযার পিছনে অনুসরণ করবে, তার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করবে, তার বিপদে সাহায্য দিবে, তার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উচু করবে না ; যাতে তার বাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে বাধা পায়, তাকে যন্ত্রণা দিবে না, যদি কোন ফল ক্রয় কর তবে তাকে কিছু দিবে, যদি না দাও তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার সন্তানদের তা বাইরে নিয়ে যেতে দিবে না ; যাতে তার সন্তানদের রাগ না জন্মায়, হাঁড়িতে কিছু রান্না করার সময় ধোঁয়ায় তাকে কষ্ট দিও না ; অন্যথায় কিছু খাদ্যাংশ তার ঘরে পাঠিয়ে দিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

اَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ وَائْزَى نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْلُغُ حَقُّ  
الْجَارِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ.

“প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি তা কি তোমরা জান? যার

হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহর অনুগৃহিত ব্যক্তি ছাড়া প্রতিবেশীর পুরাপুরি হক কেউ আদায় করতে পারবে না।”

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এক গোলাম বকরীর গোশত তৈরী করছিল। তিনি তাকে বললেন, গোশত তৈরী শেষ হলে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশী থেকে তা বন্টন করা শুরু করবে। এ কথা তিনি পর পর কয়েকবার বললেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, একই কথা আপনি আর কতবার বলবেন? তিনি বললেন, হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা তখন ভেবেছি শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।

হযরত হিশাম (রহঃ) বলেছেন : হযরত হাসান (রাযিঃ) ইহুদী কিংবা নাসারা প্রতিবেশীকে কুরবানীর গোশতের কিছু অংশ দেওয়াটাকে দোষণীয় কিছু মনে করতেন না।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন : আমার পরম প্রিয় বন্ধু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন :

إِذَا طَبَخْتَ فِدْرًا فَكَثِّرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِ  
فِي جِيرَانِكَ فَاعْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا

“যখন তরকারী রান্না কর, তার ঝোল বৃদ্ধি করো এবং প্রতিবেশীগণকে তা থেকে কিছু দাও।”

অধ্যায় : ৯১

## মদ্যপান ও তার শাস্তি

মদ সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে তিনখানি আয়াত নাযিল করেছেন। সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতখানি :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

“মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের কোন কোন উপকারও আছে।” (বাকারাহ : ২১৯)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন মুসলমান মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ ত্যাগ করেন নাই। পরবর্তীতে এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নামায আরম্ভ করেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কুরআনের সূরা ভুল পড়তে লাগলেন। তখনই দ্বিতীয় এ আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

“হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যোগো না।” (নিসা : ৪৩)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও কোন কোন মুসলমান মদ্যপান অব্যাহত রাখেন। আবার কেউ কেউ তা পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে পুনরায় এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উটের গুদদেশের একটি হাঁড় উঠিয়ে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। অতঃপর বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিক নেতাদের উদ্দেশ্য করে ক্রন্দন করে শোক

ও প্রশংসা কীর্তন করতঃ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ ঘটনা হযুর সাব্লাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে চাদর হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং হাতে যা ছিল তা তিনি লোকটির প্রতি ছুড়ে মারলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ বলতে আরম্ভ করলো : আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের ক্রোধ হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখনই মদ সম্পর্কে কুরআনের এ তৃতীয় আয়াতখানি নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَرُ رَجَسٌ مِّنْ عِندِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো— মদ, জুয়া, মূর্তি এবং হযরত জেনে তীর নিক্ষেপ এ সবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা—তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আল্লাহর স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?” (মায়দাহ : ৯১)

আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রাযিঃ) শেযাংশের জের ধরে স্বীয় আনুগত্য ও সমর্থন নিবেদন করে বললেন :

إِنْتَهَيْنَا إِنْتَهَيْنَا

“বিরত হলাম, বিরত হলাম।”

মদ্যপানের নিষিদ্ধতা-সম্পর্কিত প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَدْمُونٌ خَمْرًا

“মদ্যপানে অভ্যাসরত ব্যক্তি জাহান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

أَوَّلَ مَا نَهَانِي رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ عَنْ شَرْبِ الْخَمْرِ  
وَمَلَأَاتِ الرِّجَالَ-

“মূর্তিপূজার সর্বপ্রথম যে গর্হিত কাজের নিষেধাজ্ঞা আমার কাছে এসেছে তা হলো, মদ্যপান ও ঝগড়া-ফাসাদ।”

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :  
“যেসব লোক দুনিয়াতে মদ্যপানে একত্রিত হয়েছে, জাহান্নামে আল্লাহ্ তা’আলা তাদেরকে একত্র করবেন। সেখানে তারা পরস্পর একে অপরকে তিরস্কার ও ভৎসনা করে বলতে থাকবে— হে অমুক! আমার সাথে (দুনিয়াতে) তুমি যে আচরণ করেছ সেজন্যে আল্লাহ্ তা’আলা তোমাকে কোন ভাল বদলা না দিন ; জাহান্নামের এই আযাব তুমিই আমাকে পৌছিয়েছ। এভাবে অন্যান্যরাও বলতে থাকবে।”

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :  
“দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মদ পান করেছে, আখেরাতে আল্লাহ্ তা’আলা তাকে এমন মারাত্মক বিষ পান করাবেন, যা তার সম্মুখে আনার সাথে সাথে তার চেহারার গোশত ও চামড়া বিষপাত্রের মধ্যে খসে পড়ে যাবে। আর যখন তা তাকে পান করানো হবে তখন সর্ব শরীরের গোশত-চামড়া খসে পড়বে ; অন্যান্য দোষখীরাও এ বিসক্রিয়ায় কষ্ট বোধ করবে। ওহে লোক সকল! শুনে রাখ— যে মদ পান করে, যে এর রস বের করে, যে রস নিয়ে যায়, যে বহন করে, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে মদের মূল্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরা সকলেই এই পাপের অংশীদার ; আল্লাহ্ তা’আলা এদের নামায, রোযা, হজ্জ কবুল করবেন না যাবৎ এরা তওবা না করবে। তওবার পূর্বেই যদি এরা মারা যায়, তবে দুনিয়াতে যা পান করেছে তার প্রতি ঢোকে তাদেরকে জাহান্নামের পুঞ্জ পান করানো আল্লাহ্ তা’আলার কর্তব্য হয়ে যায়। খবরদার! খবরদার! সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য হারাম ; সর্বপ্রকার মদ হারাম।”

ইবনু আব্বিদুনিয়া (রহঃ) বলেন : “আমি এক মদ্যপন নেশাগ্রস্তের পার্শ্ব

দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম ; দেখি—সে নিজের হাতের উপর প্রস্রাব করেছে আর এ দ্বারা তার হাত ধৌত করেছে যেমন উযুকরী ব্যক্তি করে থাকে। আবার সে মুখে উচ্চারণ করছে—আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি ধীন-ইসলামকে নূরস্বরূপ এবং পানিকে পবিত্রতার উপাদানস্বরূপ দিয়েছেন।”

আকবাস ইবনে মিরদাসকে জাহেলিয়াত-যুগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল :  
আপনি মদ পান করেন না কেন ; অথচ এটা শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে ? তিনি বলেছেন : আমি এটা পছন্দ করি না যে, একটা ঘৃণ্য মূর্খতার বস্তু আমি আমার নিজ হাতে ধরবো, আবার নিজ হাতেই সেটা নিজের পেটে ভরবো ; আমি পছন্দ করি না যে, সকালে আমি সাধারণ মানুষের নেতৃত্বের ভঙ্গন অলংকৃত করবো আবার সন্ধ্যাবেলায়ই তাদের সামনে নেশাগ্রস্ত নির্বোধ-নাদান প্রতীয়মান হবো।”

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন,  
হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সমস্ত কুকার্যের উৎসমূল (মদ্যপান) থেকে তোমরা বেঁচে থাক। পূর্বকার যুগের জনৈক ইবাদত-গুয়ার ও সাধু লোক ছিল। জন-কোলাহল থেকে দূরে বিজন এক স্থানে সে ইবাদতে মগ্ন থাকতো। একদা জনৈক স্ত্রীলোকের তার সাথে সখ্যতা সৃষ্টি হয়। এ সুবাদে কোন এক বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদানের অজুহাতে আপন কৃতদাসের মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি তাকে খবর দিলে সে এসে উপস্থিত হয়। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্ত্রীলোকটি প্রতিটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়। তার সাথেই ছিল একটি বালক। স্ত্রীলোকটি বললো : আমি তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকি নাই ; এটা কেবল বাহানা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি এই বালকটিকে খুন কর অথবা আমার সাথে বাড়িচারে লিপ্ত হও কিংবা এক পেয়লা মদ পান কর। অন্যথায় আমি চিৎকার দিয়ে লোকজন জড়ো করে তোমাকে অপমান করে ছাড়বো। লোকটি কোন দিশা না পেয়ে মদ্যপানে রাজী হলো। এক পেয়লা মদ পান করে সে বলতে লাগলো : আরও দাও। এভাবে সে বারবার পান করলো। অবশেষে সে স্ত্রীলোকটির সাথে বাড়িচারে লিপ্ত হলো, এমনকি বালকটিকেও সে খুন করলো। ওহে লোক সকল! মদ্যপান পরিহার কর, তা থেকে পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে চল। আল্লাহ্র কসম, একই ব্যক্তির হৃদয়ে মদ্যপান ও ঈমান কশ্মিনকালেও একত্র

হয় না ; একটি থাকে তো অপরটি বের হয়ে যায়।”

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “আমার এক কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার জন্য আমি নবীয (খৈজুর ভিজানো পানি) তৈরী করেছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন। তিনি দেখলেন—খৈজুরের নবীযে পাগ উঠছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি আরজ করলাম—আমার পাঁড়িতা কন্যার চিকিৎসা করা। তিনি বললেন :

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا۔

“কোনরূপ হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতের জন্য রোগ-নিরাময় রাখেন নাই।”

বর্ণিত আছে, “যখন মদ হারাম করা হয়েছে, তখনই আল্লাহ তা‘আলা এর সর্ববিধ উপকারিতা উঠিয়ে নিয়েছেন।”

অধ্যায় : ৯২

মি'রাজুলনবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত কাতাদাহ্ থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে এবং তিনি হযরত মালেক ইবনে সা'সাআহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযুর আবুরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট মি'রাজ-রজনীর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : আমি কাবা ঘরের হাতীমে<sup>১</sup> ছিলাম, অধিকাংশ সময় বলেছেন, পাথরের উপর শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার নিকট একজন আগন্তুক (জিব্রাইল) আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন : আমি শুনেছি, হযুর বলেছেন : (ঐদুলি নির্দেশনা করে) আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়েছে। এক বর্ণনাকারী বলেন : আমি জারদকে জিজ্ঞাসা করলাম যিনি শ্রোতা হিসাবে আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, উক্ত ব্যাকের দ্বারা তিনি দেহের কোন কোন স্থানকে উদ্দেশ্য করেছেন? তিনি বললেন : গলদেশ হতে পশম পর্যন্ত। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর তিনি (জিব্রাইল) আমার দিল্ বের করে ঈমানী নূর দ্বারা ভরপুর এক সোনার খাঞ্চায় রেখে আমার অস্ত্রনালী ইত্যাদি ধৌত করে পুনরায় তা যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর আমার নিকট গাধার চেয়ে বড় অথচ খচ্চরের চেয়ে সামান্য ছোট সুদৃশ্য একটি জন্তু হাজির করা হলো। জারদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হামযাহ্ (হযরত আনাসের উপনাম)! এটিই কি ছিল বুরাক? হযরত আনাস (রাযিঃ) বললেন : হাঁ, এটিই বুরাক—শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি যতদূর যায়, এক এক পদক্ষেপে নিমিষের মধ্যে সে ততদূর পথ অতিক্রম করছিল। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন,

<sup>১</sup> হাতীম— কাবা ঘরেরই একাংশ, কাবা পুনঃনির্মাণের সময় তা বাইরে পড়ে গিয়েছিল এবং অদ্যাবধি সে অবস্থায়ই রয়েছে।

আমাকে সেই বুরাকের উপর আরোহন করা হলো এবং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চললেন। দেখতে দেখতে আমরা দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আসমানে) পৌঁছে গেলাম। দরজা খোলার জন্য বলা হলে ভিতর থেকে আওয়ায আসলো—“কে?” উত্তর—আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন হলো, “সঙ্গে আর কে?” উত্তর—“মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।” পুনরায় প্রশ্ন হলো, “তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?” জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর করলেন, “হাঁ।” শুনামাত্রই “মারহাবা” (খুশী হউন) ও শুভাগমন বলতে বলতে ফেরেশতা দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে (প্রথম আসমানে) ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এই যে আপনার পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি-সালাম করে বললেন :

مَرْحَبًا بِالْإِنِّبِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“যোগ্য ছেলে, যোগ্য নবী—খুশী থাক।”

অতঃপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হলেন। সেখানেও জিব্রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—“কে?” উত্তর—“আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো—“সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন—“মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—“তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?” জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর করলেন—“হাঁ।” শুনামাত্রই “খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে তাঁরাও অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে ছিলেন হযরত ইয়াহুয়া ও ঈসা আলাইহিমাস সালাম ; তাঁরা নবী আলাইহিস সালামের খালাতো ভাই। জিব্রাঈল বললেন : তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তারা জবাব দিয়ে বললেন :

مَرْحَبًا بِالْإِنِّبِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমাদের যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।”

অতঃপর আমাকে নিয়ে জিব্রাঈল (আঃ) তৃতীয় আসমানে উপনীত

হলেন। সেখানেও জিব্রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—“কে?” জিব্রাঈল বললেন, “আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো—“সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন—“মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—“তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল বললেন, “হাঁ।” শুনামাত্রই “খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে তারাও দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন :

مَرْحَبًا بِالْإِنِّبِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।”

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—“কে?” উত্তর দিলেন—“আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো—“সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন—“মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—“তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল বললেন—“হাঁ।” শুনামাত্রই “খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন : ইনি হযরত ইদরীস, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন :

مَرْحَبًا بِالْإِنِّبِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।”

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—“কে?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো, “সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন—“মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—“তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “হাঁ।” শুনামাত্রই



“খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত হারুন, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন :

مَرَحَّبًا بِالْإِنِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।”

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উপনীত হলেন। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়াজ আসলো— “কে?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন : “আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো— “সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন— “মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— “তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন— “হাঁ।” শুনামাত্রই “খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে দরজা খুলে দেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “সালাম করুন, ইনি হযরত মুসা (আঃ)।” আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন :

مَرَحَّبًا بِالْإِنِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।”

অতঃপর আমি যখন উর্ধ্ব-পথে রওয়ানা হলাম, তখন হযরত মুসা (আঃ) রুন্দন করে উঠলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, “এই নব্য যুবক পয়গাম্ভর? আমার পরে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত বেহেশতে যাবে অনেক বেশী সংখ্যায়।”

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পৌছলেন সপ্তম আসমানে। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়াজ আসলো— “কে?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো— “সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন— “মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় প্রশ্ন আসলো— “তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন— “হাঁ।” শুনামাত্রই

“খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে অভ্যর্থনা জানান। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি-সালাম করলেন এবং বললেন :

مَرَحَّبًا بِالْإِنِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“যোগ্য ছেলে যোগ্য নবী খুশী থাক।”

অতঃপর আমাকে আরও উর্ধ্বলোকে “সিদ্রাতুল-মুনতাহা”য় পৌছানো হয়েছে। সেই বৃক্ষের একটি কুল ‘হাজরের (এক স্থানের নাম) বিখ্যাত মটকার মত বড়। আর এক একটি পাতা যেন হাতীর এক একটি কান। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “এটি সিদ্রাতুল-মুনতাহা।” সেখানে দেখি চারটি নদী প্রবাহিত। জিজ্ঞাসার পর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, যে দুইটি নদী ভিতরের দিকে প্রবাহিত, সেই দুইটি বেহেশতের নদী। আর বহির্মুখী নদী দুইটি নীল ও ফুরাত (অর্থাৎ নীল নদ ও ফুরাত নদীর প্রতিকৃতি)।”

অতঃপর আমাকে বায়তুল-মামুরে প্রবেশ করানো হয়েছে। প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং একবার বের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার তাদের পালা আসে না।

অতঃপর আমার সম্মুখে এক পেয়ালা শরাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু রেখে যেটি ইচ্ছা পান করতে আমাকে বলা হলো। আমি দুধের পেয়ালাটি শুধু গ্রহণ করি। এতদ্বন্দ্বনে জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “এটি দ্বীন (ধর্ম), যার উপরে আপনি এবং আপনার উম্মত কায়ম থাকবেন।”

অতঃপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। সেখান হতে ফেরার পথে মুসা আলাইহিস্ সালামের নিকট এলে তিনি জানতে চাইলেন— কি কি ফরয করা হয়েছে। আমি বললাম, “দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।” হযরত মুসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মতের দ্বারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করা কখনও সম্ভবপর হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কতই অসুবিধা ভোগ করেছি। তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা ও

তদবীরে আমি কম করি নাই। কিন্তু সবই বৃথা গিয়েছে। কাজেই আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গিয়ে নামাযে আরও কিছু কম করিয়ে নিন। অতঃপর আমি আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে অনুরোধ জানালে পর আল্লাহ্ তা'আলা দশ ওয়াক্ত মাফ করলেন। ফেরার পথে আবার মুসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি পূর্বের ন্যায় শঙ্কা প্রকাশ করে আরও কিছুটা লাঘব করে নেওয়ার পরামর্শ দেন। আমি আবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয় আরযী পেশ করলাম। এবার আরও দশ ওয়াক্ত নামায মওকুফ করা হলো। এবারও মুসা আলাইহিস্ সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দেন। আর আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করলে আরও দশ ওয়াক্ত নামায লাঘব করে দেন। ফেরার পথে মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি পূর্ববৎ আরও কিছুটা লাঘব করে নিতে বলেন। আমি পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করি। তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেওয়া হলো। পুনরায় যখন মুসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি (শুনে) পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলাম। এবার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মুসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ফিরে আসলে এবারও তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে পারবে না। আমি বনী ইসরাঈল-এর দরুন বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি- তাদেরকে নিয়ে আমি কতই না অসুবিধা ভোগ করেছি। কাজেই অবস্থা আমার খুব জানা আছে। সুতরাং আপনি আরও কমিয়ে নিতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন। হযর সাব্বান্নাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বারবার গিয়ে আন্দার করেছি। এখন আমার লজ্জাবোধ হয়। আমি আর যেতে চাই না। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযই আমি কবুল করে নিলাম।” এমন সময় আরশ হতেও আওয়াজ আসলো :

اَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عَبْدِي -

“আমার ফরয বলবৎই রেখেছি, তবে বাস্দের কাজ লাঘব করে দিয়েছি।”

অধ্যায় : ৯৩

## জুম্ম'আর ফযীলত

জুম্ম'আর দিন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতময় দিন। এই দিনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, অনুরূপ মুসলমানদের জন্য এ দিনটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ

“যখন জুম্ম'আর দিনে নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।” (জুম্ম'আহ্ : ৯)

অতএব, জুম্ম'আর আযানের পর দুনিয়াবী কাজে মগ্ন না থেকে খুতবা ও নামাযের জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অনুরূপভাবে জুম্ম'আর জন্য বিদ্বত সৃষ্টি করে এমন কার্যসমূহ অবশ্য পরিত্যাজ্য।

হযর আকরাম সাব্বান্নাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আমার এই দিনে এবং আমার এই স্থানে জুম্ম'আ ফরয করেছেন।”

তিনি আরও ইরশাদ করেন : “বিনা উয়রে যে ব্যক্তি তিনটি জুম্ম'আ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে (দুর্ভাগ্যের) সিলমোহর লাগিয়ে দিবেন।” অন্য সূত্রে বর্ণিত— এমন ব্যক্তি ইসলামকে যেন স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, জনৈক ব্যক্তি মারা গেছে ; সে জুম্ম'আ পড়তো না এবং জামাতেও হাজির হতো না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি দোষখে যাবে। প্রশ্নকারী লোকটি এক

মাস পর্যন্ত একই প্রশ্ন করতে থাকলো এবং ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) তাকে একই জবাব দিলেন যে, সে দোষাখ যাবে।”

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—ইহুদী নাসারাদেরকে জুমু'আর এই দিনটি দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা এতে মতবিরোধ করেছে। ফলে, এ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আর আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিনের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, আমরা তা লাভ করেছি এবং পূর্ব থেকেই এ দিনটি এই উম্মতের জন্য রাখা হয়েছিল। এ উম্মতের জন্য দিনটি ঈদের দিন। সুতরাং এই উম্মত সকলের অগ্রবর্তী হয়ে গেল আর ইহুদী-নাসারাগণ পিছনে পড়ে গেল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট তশরীফ আনলেন, তার হাতে ছিল একটি শুভ কাঁচের টুকরা; বললেন, এটি জুমু'আ—আপনার রব্ব আপনার উপর ফরয করেছেন, যাতে আপনার জন্য এবং আপনার পর উম্মতের জন্য এটি দলীল স্বরূপ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এতে আমাদের জন্য কি আছে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এতে এমন একটি মহামূল্যবান মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন নেক মকসুদ পূরণের জন্য সেই মুহূর্তে দো'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবুল হবে। আর যদি সেই প্রার্থিত বস্তু তার ভাগ্যে পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ না থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীকে তদপেক্ষা অধিক প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু দান করবেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ সেই মুহূর্তে তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ কোন অনিষ্টকর বস্তু থেকে পানাহ চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তদপেক্ষা বড় বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আমাদের নিকট এ দিনটি সমস্ত দিনের সর্দার। আখেরাতে এ দিনটিকে আমরা 'ইয়াওমুল-মায়ীদ' (অতিরিক্ত পুরস্কার দিবস) বলে ডাকবো। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্রাঈল বললেন, 'বেহেশতে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি স্থান তৈরী করে রেখেছেন, যা শুভ মুশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধময় হবে। প্রতি জুমু'আর দিন আল্লাহ তা'আলা ইল্লিয়ীনে থেকে কুরসীর উপর (স্বীয় মহিমায়) অবতরণ করতঃ বেহেশতবাসীদের জন্য তজলী এখতিয়ার করেন। অতঃপর তারা আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “এমন সকল দিন অপেক্ষা যাতে সূর্য উদিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত দিনের মধ্যে) সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমু'আর দিন। এই দিনেই হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে বেহেশতে দাখেল করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে যমীনে অবতরণ করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনেই কিয়ামত কায়েম হবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দিনটি 'ইয়াওমুল-মায়ীদ' (বা অতিরিক্ত পুরস্কার দিবস), আসমানে ফেরেশতাগণ দিনটিকে এই নামেই জানেন, বেহেশতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের দিনও এটি।”

বর্ণিত আছে, “প্রত্যেক জুমু'আর দিন আল্লাহ তা'আলা ছয় লক্ষ দোযখীকে মুক্তি দান করেন।”

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “জুমু'আর দিন যদি নিরাপদ (পাপাচার ও আপদমুক্ত) থাকে, তবে (সপ্তাহের) অবশিষ্ট দিনগুলোও নিরাপদ থাকবে।”

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন : সৃষ্টি টলার পূর্বমুহূর্তে আকাশের মাঝখানে যখন থাকে, প্রতিদিন সেই সময় দোযখের আগুন উত্তপ্ত করা হয়, কাজেই তোমরা তখন নামায পড়ো না—তবে জুমু'আর দিন ব্যতীত। কেননা, জুমু'আর পূর্ণ দিনই নামাযের জন্য—এদিন দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না।”

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন—“আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন মক্কা-কে, সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রমযান মাস-কে, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন জুমু'আর দিন-কে এবং সমস্ত রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন শবে-কদর-কে।”

কথিত আছে, পক্ষীকুল এবং পোকা-মাকড় পর্যন্ত জুমু'আর দিন পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং বলে : “সালাম, সালাম, শুভদিন।”

হযরত আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাতে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য শহীদের সমতুল সওয়াব লিখে দেন এবং কবরের ফেতনা থেকে তাকে রক্ষা করেন।

## অধ্যায় : ৯৪ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রচুর হক ও অধিকার রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদা সদয় ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করবে। স্ত্রীর কোন আচরণ অপছন্দ হলে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করবে ; কারণ বৃদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে তারা অপূর্ণ। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

“আর তাদের সাথে সন্তোষে জীবন যাপন কর।” (নিসা : ১৯)  
আল্লাহ্ তা’আলা স্ত্রীদের সাথে সদ্যবহার ও হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন :

وَآخِذَ مِّنْكُمْ مِّثْقَالَ غَلِيظَةٍ ۝

“আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।” (নিসা : ২১)  
আরও ইরশাদ করেছেন :

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ۝

“তোমরা সদ্যবহার কর সহচরদের সাথেও।” (নিসা : ৩৬)  
এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ‘সহচরদের’ দ্বারা স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।  
হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের অন্তিম সময়ে যখন তাঁর জবান মুবারক আড়ষ্ট ও আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছিল—তখন ওসীয়াত করেছিলেন :

الصلوة الصلوة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهما ولا يطيقون الله

الله فِي النِّسَاءِ فَاتَّهَتْ عَوَانٌ فِي أَيْدِيكُمْ -

“নামায, নামায। তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীকে তাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে কখনও বোঝা চাপিয়ে না। স্ত্রীদের সাথে সদ্যবহার ও তাদের হক আদায়ের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর ; তারা বস্তুতঃ তোমাদের হাতে বন্দী।”

স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্র বিধান ও আমানতের অধীনে তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র দেওয়া বাক্যের মাধ্যমেই তাদের গোপনাস্ত তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে।

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ  
“যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্ তা’আলা তাকে মুসীবতের উপর হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের ছবর-সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তা’আলা তাকে ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়াঁর সমতুল্য সওয়াব দান করবেন।”

মনে রেখো— স্ত্রীকে শুধু কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম স্ত্রীর সাথে সদ্যবহার ও তার হক আদায় নয় ; বরং প্রকৃত হক আদায় ও সদ্যবহার হচ্ছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনরূপ অসদ্যবহার ও কষ্ট প্রদান হলে তাতে ধৈর্যধারণ করা, সে ক্রোধান্বিত হলে বা উত্তেজিত হলে তা অমান বদনে সয়ে নেওয়া। এ ব্যাপারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুকরণ করা চাই। তাঁর বিবিগণ কখনও তাঁর সাথে তর্ক করতেন কিংবা তাদের কেউ তাঁর থেকে পৃথক একাকীত্বেও রাত্রি যাপন করেছেন।

একদা হযরত উমর (রাযিঃ)—এর স্ত্রী তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তিনি যখন বললেন—কিহে! তুমি আমার সাথে তর্ক করছো? হযরত উমরের স্ত্রী বললেন : রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ যে ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তর্ক করেন ; অথচ তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে আমি কেন অপরাধী হবো? হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন : বড় দুর্ভাগ্য

হবে হাফসার যদি সে হযুরের সাথে তর্ক করে থাকে। অতঃপর তিনি (আপন কন্যা) হযরত হাফসাকে বললেন : “আবু কুহাফার পুত্র আবু বকরের কন্যার (আয়েশার) প্রতি তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ হিংসার উদ্রেক না হয়। মনে রেখো—সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র—এমনিভাবে তিনি হযরত হাফসাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্কের বিষয়ে সতর্ক করে আরও উপদেশ দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, একদা হযুরের কোন স্ত্রী তাঁর বুক জোরে হাত মেরে ধাক্কার ন্যায় দিয়েছিলেন। এ জন্যে স্ত্রীর মাতা তাকে শাসন করে ধমক দিচ্ছিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে ছেড়ে দিন ; তারা তো আমার সাথে এর চেয়ে আরও অধিক করে থাকে।

একদা হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এবং হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বাদানুবাদ হয়। তাঁরা দুজনেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)—কে মধ্যস্থ (শালিস-বিচারক) সাব্যস্ত করে তাঁকে খবর দিলে তিনি উপস্থিত হলেন। হযুর বললেন : হে আয়েশা! তুমি আগে বলবে না আমি আগে বলবো? হযরত আয়েশা বললেন : আপনিই আগে বলুন এবং দেখুন—সত্য ছাড়া কিছু বলবেন না। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে পদাঘাত করলেন, ফলে তাঁর মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে এল। আর বললেন : ওহে নিজের দুশমন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনও অসত্য বলতে পারেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর পিছন পার্শ্বে গিয়ে বসে রইলেন। তখন হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু বকর! তোমাকে আমরা এই কাজ করার জন্য ডাকি নাই এবং এটা আমার পছন্দও নয়।

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) রাগ হয়ে কথার ভিতর বলে ফেলেছেন : আপনি তো মনে করেন যে, খুব আল্লাহর নবী হয়ে গেছেন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এ ছিল তাঁর স্ত্রীর সাথে সুন্দর সম্বাবহার ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ। (এ সব ক্ষেত্রে নুবুওয়তের শানে বে-আদবী, অস্বীকৃতি, কিংবা অন্য কোন

ধরণের প্রশ্নই উঠে না ; এ ছিল তাদের মধ্যকার অন্ন-মধুর সম্পর্কের অভিব্যক্তি, খাটি ঈমানদারের জন্য তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।)

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বলতেন : আমি তোমার সন্তোষ কি ক্রোধের অবস্থা পূর্বাঙ্কেই আঁচ করতে পারি। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ; আপনি কিরূপে তা বুঝতে পারেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তুমি যখন খুশী থাক, তখন কথা বলতে গিয়ে বল : না, মুহাম্মদের প্রভুর কসম, আর যখন রাগান্বিত থাক তখন বল : না, ইব্রাহীমের প্রভুর কসম। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন আমি কেবল আপনার নামটাই উচ্চারণ করি না। (কিন্তু আপনার মহব্বত ও প্রেম-ভক্তি আমার অন্তঃকরণে গঁথে থাকে)

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে তাঁর বিবিগণের মধ্যে প্রথম হযরত আয়েশার মহকতই হয়েছে। তিনি বলতেন : “হে আয়েশা! আবু যরা” তার স্ত্রীর জন্য যেমন ছিল, আমিও তোমার পক্ষে তদ্রূপ। তবে আমি তোমাকে ভালো দিবা না।”

হযুর আলাইহিস্ সালাম তাঁর অন্যান্য বিবিগণকে বলতেন : তোমারা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না ; কেননা, আল্লাহর কসম—তোমাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সাথে শয্যাগ্রহণ অবস্থায় আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। (সুতরাং তাঁর মর্তবা আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই উচ্চ)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং ছোটদের প্রতি সকল মানুষ অপেক্ষা দয়ালুচিহ্নিত ছিলেন।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিগণের সাথে নেহাৎ সরল-সহজ ও সাদা-সিধা আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাদের সাথে কথা, কার্যে ও চরিত্রে উদার নীতি অবলম্বন করে চলতেন। তিনি তাদের সাথে কৌতুক-আনন্দও করতেন। একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)—এর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এতে হযরত আয়েশা অগ্রগামী হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে পুনরায় একবার যখন প্রতিযোগিতা হয়, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। এবার তিনি বললেন : দেখ হে আয়েশা! আমি কিন্তু পূর্বেরটা শোধ করে দিলাম। বিবিদের মনে আনন্দ

প্রতিবেশীকে জ্বালাতন করে। হযর বললেন : “সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।”

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ জ্ঞাপন করলে তিনি বললেন : ছবর কর। অতঃপর আরও দুবার এমনি হলো। চতুর্থবার হযর বললেন : তুমি তোমার বিছানাপত্র রাস্তায় ফেলে রাখ। লোকটি তাই করলো। এবার যেকোন পথচারী লোকটির এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে—লোকটির এই দশা কেন? কারণ জানতে পেরে লোকেরা বলতে লাগলো—জালেম প্রতিবেশীর উপর আল্লাহর লানত। এ কথা প্রতিবেশীর গোচরীভূত হওয়ার পর সে এসে লোকটিকে অনুরোধ স্বরে বলতে লাগলো—ভাই, তুমি তোমার বিছানা-পত্র স্বস্থানে নিয়ে নাও ; আমি আর কোনদিন তোমার সাথে অসদাচরণ করবো না।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ করলে তিনি বললেন : “মসজিদের দরজায় এ কথা লিখে দাও : “ওহে লোকসকল ! আশ-পাশের চল্লিশ বাড়ীর লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশী।” ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন : চতুর্দিকের প্রত্যেক দিকে চল্লিশটি করে বাড়ী বৃদ্ধাণে হয়েছে। হযর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : স্ত্রীলোক, বাড়ী এবং ঘোড়া এই তিনের মাঝে শুভ এবং অশুভ দুটিই রয়েছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে শুভ হচ্ছে, তার মহর কম হওয়া, সহজে বিবাহ হয়ে যাওয়া এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের হওয়া। এর অশুভ দিক হচ্ছে, মহর বেশী হওয়া, সহজে বিবাহ না হওয়া এবং দুশ্চরিত্রা হওয়া।

বাড়ীর ব্যাপারে শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, বাড়ী প্রশস্ত হওয়া, প্রতিবেশী সং হওয়া। আর অশুভ দিক হচ্ছে, বাড়ী সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী অসং হওয়া।

ঘোড়ার শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, মালিকের বশীভূত হয়ে থাকা এবং ঘোড়ার মধ্যে কোনরূপ কুঅভ্যাস না থাকা। আর অশুভ ও মন্দ দিক হচ্ছে, মালিকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হওয়া এবং কুঅভ্যাস থাকা।

এ কথাও অতি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাড়া-প্রতিবেশীর

দায়িত্ব শুধু এতটুকুই নয় যে, সে কাউকে কষ্ট দিবে না ; বরং অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হলে তা সহ্য করাও প্রতিবেশীর দায়িত্ব। কেননা, প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার সাথে সদ্ভাবহার তখনই প্রতিফলিত হবে যখন তার কর্তৃক প্রদত্ত কষ্টে ছবর করা হবে ; কেবল কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম প্রতিবেশীর হক-আদায় নয়। অধিকন্তু প্রতিবেশীর সাথে বিনয় ও বিনম্র স্বভাব অবলম্বন করবে, তার প্রতি অনুকম্পা-অনুগ্রহ করবে— এটা জরুরী। বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন দরিদ্র প্রতিবেশী ধনী প্রতিবেশীর আচল ধরে ফেলবে এবং অভিযোগ করবে— আয় রব! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন তার ধন-সম্পদ থেকে আমাকে দান করা হতে বিরত রয়েছে, কেন সে আমা থেকে তার দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

একদা হযরত ইবনে মুকাফ্ফা জানতে পেলেন যে, ঋণ পরিশোধের জন্য তার প্রতিবেশী বাড়ী বিক্রি করে দিচ্ছে। তিনি তাকে তা বিক্রি করতে বারণ করলেন এবং পরিমিত টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য হাদিয়া করে দিলেন।

এক বুয়ুর্গ তাঁর বাড়ীতে ইদুরের উৎপাতের কথা উল্লেখ করলে এক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়ে বললো : আপনি বিড়াল পোষলে সমস্যা থাকবে না। তিনি বললেন : এতে খুবই আশংকা রয়েছে যে, বিড়ালের ডাক শুনে ইদুর ভয়ে আমার বাড়ী ছেড়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নিবে। আমি নিজের জন্য এক্সপ হওয়াটা পছন্দ করি না, তাই আমার প্রতিবেশীর জন্যে এটা কেন পছন্দ করবো? সুতরাং এ হতে পারে না।”

মোটকথা, পাড়া-প্রতিবেশীর যেসব হক ও অধিকার রয়েছে, তা মোটামুটিভাবে (সংক্ষেপে) এই যে, সাক্ষাতে তুমি আগে তাকে সালাম দিবে, অথবা আলাপ দীর্ঘ করবে না, বেশী বেশী প্রশ্নের অবতারণা করবে না, অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, মসীবতে তাকে সাহায্য দিবে, শোক-দুঃখে তাকে সঙ্গ দিবে, তার আনন্দে তুমিও আনন্দ প্রকাশ করবে ; তাকে অভিনন্দিত করবে, তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবে, তার বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে তাকাবে না ; তার গোপনীয়তা নষ্ট করবে না, তার বাড়ীর দেওয়ালে কোন পশু-ছানা বা অন্য কোন বস্তু রেখে তাকে বিরক্ত করবে না, তার সীমানাস্থিত ড়েন বা প্রণালীতে পানি প্রবাহিত করবে না, তার আদিনায

ধূলি-বালি বা মাটি নিক্ষেপ করবে না, তার গৃহে প্রবেশের রাস্তা সংকর্ণ করবে না, ঘরে কিছু নিয়ে যেতে থাকলে সৈদিকে দৃষ্টিপাত করবে না, তার কোন গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেলে তা গোপন করে রাখবে ; প্রচার করবে না, আপদ-বিপদে তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীর প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টি রাখবে, তার বিরুদ্ধে কোন কথায় কণ্ঠপাত করবে না, তার ইযত-সম্মত রক্ষায় তৎপর থাকবে, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখবে, পরিচারিকার প্রতি তাকাবে না, তার শিশু-সন্তানদের সাথে সবিনয় মিষ্ট-মধুর আচরণ করবে, দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞ হলে মহব্বতের সাথে তাকে সং-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে, এমনিভাবে পার্শ্ব বিষয়েও তাকে সুপারামর্শ প্রদান করবে। এ হচ্ছে সাধারণ পাজি-প্রতিবেশীর মোটামুটি হকসমূহ।

হযর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “তোমরা কি জান প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি? সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, তার সহযোগিতায় শরীক হবে, সে তোমার কাছে ঋণ চাইলে ঋণ দিবে, সে অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে, সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, তার মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হবে ; জানাযার পিছনে অনুসরণ করবে, তার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করবে, তার বিপদে সাহায্য দিবে, তার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উচু করবে না ; যাতে তার বাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে বাধা পায়, তাকে যন্ত্রণা দিবে না, যদি কোন ফল ক্রয় কর তবে তাকে কিছু দিবে, যদি না দাও তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার সন্তানদের তা বাইরে নিয়ে যেতে দিবে না ; যাতে তার সন্তানদের রাগ না জন্মায়, হাঁড়িতে কিছু রান্না করার সময় ধোঁয়ায় তাকে কষ্ট দিও না ; অন্যথায় কিছু খাদ্যাংশ তার ঘরে পাঠিয়ে দিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

اَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ وَائْزَى نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْلُغُ حَقُّ  
الْجَارِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ.

“প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি তা কি তোমরা জান? যার

হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহর অনুগৃহিত ব্যক্তি ছাড়া প্রতিবেশীর পুরাপুরি হক কেউ আদায় করতে পারবে না।”

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এক গোলাম বকরীর গোশত তৈরী করছিল। তিনি তাকে বললেন, গোশত তৈরী শেষ হলে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশী থেকে তা বন্টন করা শুরু করবে। এ কথা তিনি পর পর কয়েকবার বললেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, একই কথা আপনি আর কতবার বলবেন? তিনি বললেন, হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা তখন ভেবেছি শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।

হযরত হিশাম (রহঃ) বলেছেন : হযরত হাসান (রাযিঃ) ইহুদী কিংবা নাসারা প্রতিবেশীকে কুরবানীর গোশতের কিছু অংশ দেওয়াটাকে দোষণীয় কিছু মনে করতেন না।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন : আমার পরম প্রিয় বন্ধু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন :

إِذَا طَبَخْتَ فِدْرًا فَكَثِّرْ مَاءَهَا ثُمَّ أَنْظِرْ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتٍ  
فِي جِيرَانِكَ فَاعْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا

“যখন তরকারী রান্না কর, তার ঝোল বৃদ্ধি করো এবং প্রতিবেশীগণকে তা থেকে কিছু দাও।”

## অধ্যায় : ৯১ মদ্যপান ও তার শাস্তি

মদ সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে তিনখানি আয়াত নাযিল করেছেন। সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতখানি :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

“মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের কোন কোন উপকারও আছে।” (বাকারাহ : ২১৯)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন মুসলমান মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ ত্যাগ করেন নাই। পরবর্তীতে এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নামায আরম্ভ করেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কুরআনের সূরা ভুল পড়তে লাগলেন। তখনই দ্বিতীয় এ আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

“হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যোগো না।” (নিসা : ৪৩)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও কোন কোন মুসলমান মদ্যপান অব্যাহত রাখেন। আবার কেউ কেউ তা পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে পুনরায় এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উটের গুদদেশের একটি হাঁড় উঠিয়ে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। অতঃপর বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিক নেতাদের উদ্দেশ্য করে ক্রন্দন করে শোক

ও প্রশংসা কীর্তন করতঃ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ ঘটনা হযুর সাব্বাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে চাদর হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং হাতে যা ছিল তা তিনি লোকটির প্রতি ছুড়ে মারলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ বলতে আরম্ভ করলো : আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের ক্রোধ হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখনই মদ সম্পর্কে কুরআনের এ তৃতীয় আয়াতখানি নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَرُ رَجَسٌ مِنْ عِلَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো— মদ, জুয়া, মূর্তি এবং হযরত জেনে তীর নিক্ষেপ এ সবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা—তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আল্লাহর স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?” (মায়দাহ : ৯১)

আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রাযিঃ) শেযাংশের জের ধরে স্বীয় আনুগত্য ও সমর্থন নিবেদন করে বললেন :

إِنْتَهَيْنَا إِنْتَهَيْنَا

“বিরত হলাম, বিরত হলাম।”

মদ্যপানের নিষিদ্ধতা-সম্পর্কিত প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَدْمُونٌ خَمْرٍ

“মদ্যপানে অভ্যাসরত ব্যক্তি জাহান্নাতে প্রবেশ করবে না।”



অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

أَوَّلَ مَا نَهَانِي رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ عَنْ شَرْبِ الْخَمْرِ  
وَمَلْحَاتِ الرِّجَالِ -

“মূর্তিপূজার সর্বপ্রথম যে গর্হিত কাজের নিষেধাজ্ঞা আমার কাছে এসেছে তা হলো, মদ্যপান ও ঝগড়া-ফাসাদ।”

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

“যেসব লোক দুনিয়াতে মদ্যপানে একত্রিত হয়েছে, জাহান্নামে আল্লাহ্ তা’আলা তাদেরকে একত্র করবেন। সেখানে তারা পরস্পর একে অপরকে তিরস্কার ও ভৎসনা করে বলতে থাকবে— হে অমুক! আমার সাথে (দুনিয়াতে) তুমি যে আচরণ করেছ সেজন্যে আল্লাহ্ তা’আলা তোমাকে কোন ভাল বদলা না দিন ; জাহান্নামের এই আযাব তুমিই আমাকে পৌছিয়েছ। এভাবে অন্যান্যরাও বলতে থাকবে।”

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :  
“দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মদ পান করেছে, আখেরাতে আল্লাহ্ তা’আলা তাকে এমন মারাত্মক বিষ পান করাবেন, যা তার সম্মুখে আনার সাথে সাথে তার চেহারার গোশত ও চামড়া বিষপাত্রের মধ্যে খসে পড়ে যাবে। আর যখন তা তাকে পান করানো হবে তখন সর্ব শরীরের গোশত-চামড়া খসে পড়বে ; অন্যান্য দোষখীরাও এ বিষক্রিয়ায় কষ্ট বোধ করবে। ওহে লোক সকল! শুনে রাখ— যে মদ পান করে, যে এর রস বের করে, যে রস নিয়ে যায়, যে বহন করে, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে মদের মূল্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরা সকলেই এই পাপের অংশীদার ; আল্লাহ্ তা’আলা এদের নামায, রোযা, হজ্জ কবুল করবেন না যাবৎ এরা তওবা না করবে। তওবার পূর্বেই যদি এরা মারা যায়, তবে দুনিয়াতে যা পান করেছে তার প্রতি ঢোকে তাদেরকে জাহান্নামের পুঞ্জ পান করানো আল্লাহ্ তা’আলার কর্তব্য হয়ে যায়। খবরদার! খবরদার! সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য হারাম ; সর্বপ্রকার মদ হারাম।”

ইবনু আব্বিদুনিয়া (রহঃ) বলেন : “আমি এক মদ্যপন নেশাগ্রস্তের পার্শ্ব

দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম ; দেখি—সে নিজের হাতের উপর প্রস্রাব করেছে আর এ দ্বারা তার হাত ধৌত করেছে যেমন উযুকরী ব্যক্তি করে থাকে। আবার সে মুখে উচ্চারণ করছে—আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি ধীন-ইসলামকে নূরস্বরূপ এবং পানিকে পবিত্রতার উপাদানস্বরূপ দিয়েছেন।”

আকবাস ইবনে মিরদাসকে জাহেলিয়াত-যুগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : আপনি মদ পান করেন না কেন ; অথচ এটা শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে? তিনি বলেছেন : আমি এটা পছন্দ করি না যে, একটা ঘৃণ্য মূর্খতার বস্তু আমি আমার নিজ হাতে ধরবো, আবার নিজ হাতেই সেটা নিজের পেটে ভরবো ; আমি পছন্দ করি না যে, সকালে আমি সাধারণ মানুষের নেতৃত্বের ভঙ্গন অলংকৃত করবো আবার সন্ধ্যাবেলায়ই তাদের সামনে নেশাগ্রস্ত নির্বোধ-নাদান প্রতীয়মান হবো।”

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সমস্ত কুকার্যের উৎসমূল (মদ্যপান) থেকে তোমরা বেঁচে থাক। পূর্বকার যুগের জনৈক ইবাদত-গুহার ও সাধু লোক ছিল। জন-কোলাহল থেকে দূরে বিজন এক স্থানে সে ইবাদতে মগ্ন থাকতো। একদা জনৈক স্ত্রীলোকের তার সাথে সখ্যতা সৃষ্টি হয়। এ সুবাদে কোন এক বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদানের অজুহাতে আপন কৃতদাসের মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি তাকে খবর দিলে সে এসে উপস্থিত হয়। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্ত্রীলোকটি প্রতিটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়। তার সাথেই ছিল একটি বালক। স্ত্রীলোকটি বললো : আমি তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকি নাই ; এটা কেবল বাহানা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি এই বালকটিকে খুন কর অথবা আমার সাথে বাড়িচারে লিপ্ত হও কিংবা এক পেয়লা মদ পান কর। অন্যথায় আমি চিৎকার দিয়ে লোকজন জড়ো করে তোমাকে অপমান করে ছাড়বো। লোকটি কোন দিশা না পেয়ে মদ্যপানে রাজী হলো। এক পেয়লা মদ পান করে সে বলতে লাগলো : আরও দাও। এভাবে সে বারবার পান করলো। অবশেষে সে স্ত্রীলোকটির সাথে বাড়িচারে লিপ্ত হলো, এমনকি বালকটিকেও সে খুন করলো। ওহে লোক সকল! মদ্যপান পরিহার কর, তা থেকে পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে চল। আল্লাহ্র কসম, একই ব্যক্তির হৃদয়ে মদ্যপান ও ঈমান কশ্মিনকালেও একত্র

হয় না ; একটি থাকে তো অপরটি বের হয়ে যায়।”

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “আমার এক কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার জন্য আমি নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) তৈরী করেছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন। তিনি দেখলেন—খেজুরের নবীযে পাগ উঠছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি আরজ করলাম—আমার পাঁড়িতা কন্যার চিকিৎসা করা। তিনি বললেন :

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا۔

“কোনরূপ হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতের জন্য রোগ-নিরাময় রাখেন নাই।”

বর্ণিত আছে, “যখন মদ হারাম করা হয়েছে, তখনই আল্লাহ তা‘আলা এর সর্ববিধ উপকারিতা উঠিয়ে নিয়েছেন।”

অধ্যায় : ৯২

মি'রাজুলনবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত কাতাদাহ্ থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে এবং তিনি হযরত মালেক ইবনে সা'সাআহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযুর আবুরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট মি'রাজ-রজনীর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : আমি কাবা ঘরের হাতীমে<sup>১</sup> ছিলাম, অধিকাংশ সময় বলেছেন, পাথরের উপর শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার নিকট একজন আগন্তুক (জিব্রাইল) আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন : আমি শুনেছি, হযুর বলেছেন : (ঐদুলি নির্দেশনা করে) আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়েছে। এক বর্ণনাকারী বলেন : আমি জারদকে জিজ্ঞাসা করলাম যিনি শ্রোতা হিসাবে আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, উক্ত ব্যাকের দ্বারা তিনি দেহের কোন কোন স্থানকে উদ্দেশ্য করেছেন? তিনি বললেন : গলদেশ হতে পশম পর্যন্ত। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অতঃপর তিনি (জিব্রাইল) আমার দিল্ বের করে ঈমানী নূর দ্বারা ভরপুর এক সোনার খাঞ্চায় রেখে আমার অস্ত্রনালী ইত্যাদি ধৌত করে পুনরায় তা যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর আমার নিকট গাধার চেয়ে বড় অথচ খচ্চরের চেয়ে সামান্য ছোট সুদৃশ্য একটি জন্তু হাজির করা হলো। জারদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হামযাহ্ (হযরত আনাসের উপনাম)! এটিই কি ছিল বুরাক? হযরত আনাস (রাযিঃ) বললেন : হাঁ, এটিই বুরাক—শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি যতদূর যায়, এক এক পদক্ষেপে নিমিষের মধ্যে সে ততদূর পথ অতিক্রম করছিল। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন,

<sup>১</sup> হাতীম— কাবা ঘরেরই একাংশ, কাবা পুনঃনির্মাণের সময় তা বাইরে পড়ে গিয়েছিল এবং অদ্যাবধি সে অবস্থায়ই রয়েছে।

আমাকে সেই বুরাকের উপর আরোহন করা হলো এবং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চললেন। দেখতে দেখতে আমরা দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আসমানে) পৌঁছে গেলাম। দরজা খোলার জন্য বলা হলে ভিতর থেকে আওয়ায আসলো—“কে?” উত্তর—আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন হলো, “সঙ্গে আর কে?” উত্তর—“মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।” পুনরায় প্রশ্ন হলো, “তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?” জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর করলেন, “হাঁ।” শুনামাত্রই “মারহাবা” (খুশী হউন) ও শুভাগমন বলতে বলতে ফেরেশতা দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে (প্রথম আসমানে) ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এই যে আপনার পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি-সালাম করে বললেন :

مَرْحَبًا بِالْإِنِّبِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“যোগ্য ছেলে, যোগ্য নবী—খুশী থাক।”

অতঃপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হলেন। সেখানেও জিব্রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—“কে?” উত্তর—“আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো—“সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন—“মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—“তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?” জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর করলেন—“হাঁ।” শুনামাত্রই “খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে তাঁরাও অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে ছিলেন হযরত ইয়াহুয়া ও ঈসা আলাইহিমাস সালাম ; তাঁরা নবী আলাইহিস সালামের খালাতো ভাই। জিব্রাঈল বললেন : তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তারা জবাব দিয়ে বললেন :

مَرْحَبًا بِالْإِنِّبِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমাদের যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।”

অতঃপর আমাকে নিয়ে জিব্রাঈল (আঃ) তৃতীয় আসমানে উপনীত

হলেন। সেখানেও জিব্রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—“কে?” জিব্রাঈল বললেন, “আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো—“সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন—“মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—“তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল বললেন, “হাঁ।” শুনামাত্রই “খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে তারাও দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন :

مَرْحَبًا بِالْإِنِّبِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।”

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—“কে?” উত্তর দিলেন—“আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো—“সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন—“মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—“তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল বললেন—“হাঁ।” শুনামাত্রই “খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন : ইনি হযরত ইদরীস, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন :

مَرْحَبًا بِالْإِنِّبِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।”

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—“কে?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো, “সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন—“মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—“তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “হাঁ।” শুনামাত্রই

“খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত হারুন, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন :

مَرَحَّبًا بِالْإِنِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।”

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উপনীত হলেন। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়াজ আসলো— “কে?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন : “আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো— “সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন— “মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— “তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন— “হাঁ।” শুনামাত্রই “খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে দরজা খুলে দেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “সালাম করুন, ইনি হযরত মুসা (আঃ)।” আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন :

مَرَحَّبًا بِالْإِنِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।”

অতঃপর আমি যখন উর্ধ্ব-পথে রওয়ানা হলাম, তখন হযরত মুসা (আঃ) রুন্দন করে উঠলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, “এই নব্য যুবক পয়গাম্ভর? আমার পরে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত বেহেশতে যাবে অনেক বেশী সংখ্যায়।”

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পৌছলেন সপ্তম আসমানে। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়াজ আসলো— “কে?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “আমি জিব্রাঈল।” প্রশ্ন আসলো— “সঙ্গে কে?” উত্তর দিলেন— “মুহাম্মদ” (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় প্রশ্ন আসলো— “তিনি কি আমন্ত্রিত?” জিব্রাঈল (আঃ) বললেন— “হাঁ।” শুনামাত্রই

“খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন” বলে অভ্যর্থনা জানান। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি-সালাম করলেন এবং বললেন :

مَرَحَّبًا بِالْإِنِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“যোগ্য ছেলে যোগ্য নবী খুশী থাক।”

অতঃপর আমাকে আরও উর্ধ্বলোকে “সিদ্রাতুল-মুনতাহা”য় পৌছানো হয়েছে। সেই বৃক্ষের একটি কুল ‘হাজরের (এক স্থানের নাম) বিখ্যাত মটকার মত বড়। আর এক একটি পাতা যেন হাতীর এক একটি কান। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “এটি সিদ্দ্রাতুল-মুনতাহা।” সেখানে দেখি চারটি নদী প্রবাহিত। জিজ্ঞাসার পর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, যে দুইটি নদী ভিতরের দিকে প্রবাহিত, সেই দুইটি বেহেশতের নদী। আর বহির্মুখী নদী দুইটি নীল ও ফুরাত (অর্থাৎ নীল নদ ও ফুরাত নদীর প্রতিকৃতি)।”

অতঃপর আমাকে বায়তুল-মামুরে প্রবেশ করানো হয়েছে। প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং একবার বের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার তাদের পালা আসে না।

অতঃপর আমার সম্মুখে এক পেয়ালা শরাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু রেখে যেটি ইচ্ছা পান করতে আমাকে বলা হলো। আমি দুধের পেয়ালাটি শুধু গ্রহণ করি। এতদ্বন্দ্বনে জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, “এটি ধীন (ধর্ম), যার উপরে আপনি এবং আপনার উম্মত কায়ম থাকবেন।”

অতঃপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। সেখান হতে ফেরার পথে মুসা আলাইহিস্ সালামের নিকট এলে তিনি জানতে চাইলেন— কি কি ফরয করা হয়েছে। আমি বললাম, “দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।” হযরত মুসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মতের দ্বারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করা কখনও সম্ভবপর হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কতই অসুবিধা ভোগ করেছি। তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা ও

তদবীরে আমি কম করি নাই। কিন্তু সবই বৃথা গিয়েছে। কাজেই আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গিয়ে নামাযে আরও কিছু কম করিয়ে নিন। অতঃপর আমি আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে অনুরোধ জানালে পর আল্লাহ্ তা'আলা দশ ওয়াক্ত মাফ করলেন। ফেরার পথে আবার মুসা (আঃ)—এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি পূর্বের ন্যায় শঙ্কা প্রকাশ করে আরও কিছুটা লাঘব করে নেওয়ার পরামর্শ দেন। আমি আবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয় আরযী পেশ করলাম। এবার আরও দশ ওয়াক্ত নামায মওকুফ করা হলো। এবারও মুসা আলাইহিস্ সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দেন। আর আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করলে আরও দশ ওয়াক্ত নামায লাঘব করে দেন। ফেরার পথে মুসা (আঃ)—এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি পূর্ববৎ আরও কিছুটা লাঘব করে নিতে বলেন। আমি পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করি। তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেওয়া হলো। পুনরায় যখন মুসা (আঃ)—এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি (শুনে) পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলাম। এবার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মুসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ফিরে আসলে এবারও তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে পারবে না। আমি বনী ইসরাঈল—এর দরুন বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—তাদেরকে নিয়ে আমি কতই না অসুবিধা ভোগ করেছি। কাজেই অবস্থা আমার খুব জানা আছে। সুতরাং আপনি আরও কমিয়ে নিতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন। হযর সাব্বান্নাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বারবার গিয়ে আন্দার করেছি। এখন আমার লজ্জাবোধ হয়। আমি আর যেতে চাই না। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযই আমি কবুল করে নিলাম।” এমন সময় আরশ হতেও আওয়াজ আসলো :

اَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عَبْدِي -

“আমার ফরয বলবৎই রেখেছি, তবে বাস্দের কাজ লাঘব করে দিয়েছি।”

অধ্যায় : ৯৩

## জুম্ম'আর ফযীলত

জুম্ম'আর দিন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতময় দিন। এই দিনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, অনুরূপ মুসলমানদের জন্য এ দিনটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ

“যখন জুম্ম'আর দিনে নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।” (জুম্ম'আহ্ : ৯)

অতএব, জুম্ম'আর আযানের পর দুনিয়াবী কাজে মগ্ন না থেকে খুতবা ও নামাযের জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অনুরূপভাবে জুম্ম'আর জন্য বিদ্বতা সৃষ্টি করে এমন কার্যসমূহ অবশ্য পরিত্যাজ্য।

হযর আকরাম সাব্বান্নাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আমার এই দিনে এবং আমার এই স্থানে জুম্ম'আ ফরয করেছেন।”

তিনি আরও ইরশাদ করেন : “বিনা উয়রে যে ব্যক্তি তিনটি জুম্ম'আ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে (দুর্ভাগ্যের) সিলমোহর লাগিয়ে দিবেন।” অন্য সূত্রে বর্ণিত— এমন ব্যক্তি ইসলামকে যেন স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আক্বাস (রাযিঃ)—এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, জনৈক ব্যক্তি মারা গেছে ; সে জুম্ম'আ পড়তো না এবং জামাতেও হাজির হতো না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি দোষখে যাবে। প্রশ্নকারী লোকটি এক

মাস পর্যন্ত একই প্রশ্ন করতে থাকলো এবং ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) তাকে একই জবাব দিলেন যে, সে দোষাখ যাবে।”

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—ইহুদী নাসারাদেরকে জুমু'আর এই দিনটি দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা এতে মতবিরোধ করেছে। ফলে, এ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আর আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিনের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, আমরা তা লাভ করেছি এবং পূর্ব থেকেই এ দিনটি এই উম্মতের জন্য রাখা হয়েছিল। এ উম্মতের জন্য দিনটি ঈদের দিন। সুতরাং এই উম্মত সকলের অগ্রবর্তী হয়ে গেল আর ইহুদী-নাসারাগণ পিছনে পড়ে গেল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট তশরীফ আনলেন, তার হাতে ছিল একটি শুভ কাঁচের টুকরা; বললেন, এটি জুমু'আ—আপনার রব্ব আপনার উপর ফরয করেছেন, যাতে আপনার জন্য এবং আপনার পর উম্মতের জন্য এটি দলীল স্বরূপ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এতে আমাদের জন্য কি আছে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এতে এমন একটি মহামূল্যবান মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন নেক মকসুদ পূরণের জন্য সেই মুহূর্তে দো'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবুল হবে। আর যদি সেই প্রার্থিত বস্তু তার ভাগ্যে পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ না থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীকে তদপেক্ষা অধিক প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু দান করবেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ সেই মুহূর্তে তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ কোন অনিষ্টকর বস্তু থেকে পানাহ চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তদপেক্ষা বড় বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আমাদের নিকট এ দিনটি সমস্ত দিনের সর্দার। আখেরাতে এ দিনটিকে আমরা 'ইয়াওমুল-মায়ীদ' (অতিরিক্ত পুরস্কার দিবস) বলে ডাকবো। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্রাঈল বললেন, 'বেহেশতে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি স্থান তৈরী করে রেখেছেন, যা শুভ মুশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধময় হবে। প্রতি জুমু'আর দিন আল্লাহ তা'আলা ইল্লিয়ীনে থেকে কুরসীর উপর (স্বীয় মহিমায়) অবতরণ করতঃ বেহেশতবাসীদের জন্য তজলী এখতিয়ার করেন। অতঃপর তারা আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “এমন সকল দিন অপেক্ষা যাতে সূর্য উদিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত দিনের মধ্যে) সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমু'আর দিন। এই দিনেই হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে বেহেশতে দাখেল করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে যমীনে অবতরণ করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনেই কিয়ামত কায়েম হবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দিনটি 'ইয়াওমুল-মায়ীদ' (বা অতিরিক্ত পুরস্কার দিবস), আসমানে ফেরেশতাগণ দিনটিকে এই নামেই জানেন, বেহেশতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের দিনও এটি।”

বর্ণিত আছে, “প্রত্যেক জুমু'আর দিন আল্লাহ তা'আলা ছয় লক্ষ দোযখীকে মুক্তি দান করেন।”

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “জুমু'আর দিন যদি নিরাপদ (পাপাচার ও আপদমুক্ত) থাকে, তবে (সপ্তাহের) অবশিষ্ট দিনগুলোও নিরাপদ থাকবে।”

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন : সৃষ্টি টলার পূর্বমুহূর্তে আকাশের মাঝখানে যখন থাকে, প্রতিদিন সেই সময় দোযখের আগুন উত্তপ্ত করা হয়, কাজেই তোমরা তখন নামায পড়ো না—তবে জুমু'আর দিন ব্যতীত। কেননা, জুমু'আর পূর্ণ দিনই নামাযের জন্য—এদিন দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না।”

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন—“আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন মক্কা-কে, সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রমযান মাস-কে, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন জুমু'আর দিন-কে এবং সমস্ত রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন শবে-কদর-কে।”

কথিত আছে, পক্ষীকুল এবং পোকা-মাকড় পর্যন্ত জুমু'আর দিন পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং বলে : “সালাম, সালাম, শুভদিন।”

হযরত আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাতে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য শহীদদের সমতুল সওয়াব লিখে দেন এবং কবরের ফেটনা থেকে তাকে রক্ষা করেন।

## অধ্যায় : ৯৪ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রচুর হক ও অধিকার রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদা সদয় ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করবে। স্ত্রীর কোন আচরণ অপছন্দ হলে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করবে ; কারণ বৃদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে তারা অপূর্ণ। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

“আর তাদের সাথে সম্ভাবে জীবন যাপন কর।” (নিসা : ১৯)

আল্লাহ্ তা’আলা স্ত্রীদের সাথে সদ্যবহার ও হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন :

وَآخِذَ مِّنْكُمْ مِّثْقَالَ غَلِيظَةٍ ۝

“আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।” (নিসা : ২১)

আরও ইরশাদ করেছেন :

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ۝

“(তোমরা সদ্যবহার কর) সহচরদের সাথেও।” (নিসা : ৩৬)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ‘সহচরদের’ দ্বারা স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের অন্তিম সময়ে যখন তাঁর জবান মুবারক আড়ষ্ট ও আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছিল—তখন ওসীয়াত করেছিলেন :

الصلوة الصلوة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهما ولا يطيقون الله

الله فِي النِّسَاءِ فَاتَّهَتْ عَوَانٌ فِي أَيْدِيكُمْ -

“নামায, নামায। তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীকে তাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে কখনও বোঝা চাপিয়ে না। স্ত্রীদের সাথে সদ্যবহার ও তাদের হক আদায়ের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর ; তারা বস্তুতঃ তোমাদের হাতে বন্দী।”

স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্র বিধান ও আমানতের অধীনে তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র দেওয়া বাক্যের মাধ্যমেই তাদের গোপনাস্ত তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে।

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্ তা’আলা তাকে মুসীবতের উপর হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের ছবর-সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তা’আলা তাকে ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়াঁর সমতুল্য সওয়াব দান করবেন।”

মনে রেখো— স্ত্রীকে শুধু কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম স্ত্রীর সাথে সদ্যবহার ও তার হক আদায় নয় ; বরং প্রকৃত হক আদায় ও সদ্যবহার হচ্ছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনরূপ অসদ্যবহার ও কষ্ট প্রদান হলে তাতে ধৈর্যধারণ করা, সে ক্রোধান্বিত হলে বা উত্তেজিত হলে তা অমান বদনে সয়ে নেওয়া। এ ব্যাপারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুকরণ করা চাই। তাঁর বিবিগণ কখনও তাঁর সাথে তর্ক করতেন কিংবা তাদের কেউ তাঁর থেকে পৃথক একাকীত্বেও রাত্রি যাপন করেছেন।

একদা হযরত উমর (রাযিঃ)—এর স্ত্রী তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তিনি যখন বললেন—কিহে! তুমি আমার সাথে তর্ক করছো? হযরত উমরের স্ত্রী বললেন : রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ যে ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তর্ক করেন ; অথচ তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে আমি কেন অপরাধী হবো? হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন : বড় দুর্ভাগ্য

হবে হাফসার যদি সে হযূরের সাথে তর্ক করে থাকে। অতঃপর তিনি (আপন কন্যা) হযরত হাফসাকে বললেন : “আবু কুহাফার পুত্র আবু বকরের কন্যার (আয়েশার) প্রতি তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ হিংসার উদ্রেক না হয়। মনে রেখো—সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র—এমনিভাবে তিনি হযরত হাফসাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্কের বিষয়ে সতর্ক করে আরও উপদেশ দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, একদা হযূরের কোন স্ত্রী তাঁর বৃকে জোরে হাত মেরে ধাক্কার ন্যায় দিয়েছিলেন। এ জন্যে স্ত্রীর মাতা তাকে শাসন করে ধমক দিচ্ছিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে ছেড়ে দিন ; তারা তো আমার সাথে এর চেয়ে আরও অধিক করে থাকে।

একদা হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এবং হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বাদানুবাদ হয়। তাঁরা দুজনেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)—কে মধ্যস্থ (শালিস-বিচারক) সাব্যস্ত করে তাঁকে খবর দিলে তিনি উপস্থিত হলেন। হযূর বললেন : হে আয়েশা! তুমি আগে বলবে না আমি আগে বলবো? হযরত আয়েশা বললেন : আপনিই আগে বলুন এবং দেখুন—সত্য ছাড়া কিছু বলবেন না। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে পদাঘাত করলেন, ফলে তাঁর মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে এল। আর বললেন : ওহে নিজের দূশমন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনও অসত্য বলতে পারেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর পিছন পার্শ্বে গিয়ে বসে রইলেন। তখন হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু বকর! তোমাকে আমরা এই কাজ করার জন্য ডাকি নাই এবং এটা আমার পছন্দও নয়।

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) রাগ হয়ে কথার ভিতর বলে ফেলেছেন : আপনি তো মনে করেন যে, খুব আল্লাহর নবী হয়ে গেছেন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এ ছিল তাঁর স্ত্রীর সাথে সুন্দর সম্বাবহার ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ। (এ সব ক্ষেত্রে নুবুওয়তের শানে বে-আদবী, অস্বীকৃতি, কিংবা অন্য কোন

ধরণের প্রশ্নই উঠে না ; এ ছিল তাদের মধ্যকার অন্ন-মধুর সম্পর্কের অভিব্যক্তি, খাটি ঈমানদারের জন্য তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।)

হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বলতেন : আমি তোমার সন্তোষ কি ক্রোধের অবস্থা পূর্বাঙ্কেই আঁচ করতে পারি। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ; আপনি কিরূপে তা বুঝতে পারেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তুমি যখন খুশী থাক, তখন কথা বলতে গিয়ে বল : না, মুহাম্মদের প্রভুর কসম, আর যখন রাগান্বিত থাক তখন বল : না, ইব্রাহীমের প্রভুর কসম। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন আমি কেবল আপনার নামটাই উচ্চারণ করি না। (কিন্তু আপনার মহব্বত ও প্রেম-ভক্তি আমার অন্তঃকরণে গঁথে থাকে)

হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে তাঁর বিবিগণের মধ্যে প্রথম হযরত আয়েশার মহকতই হয়েছে। তিনি বলতেন : “হে আয়েশা! আবু যরা” তার স্ত্রীর জন্য যেমন ছিল, আমিও তোমার পক্ষে তদ্রূপ। তবে আমি তোমাকে তালাক দিবো না।”

হযূর আলাইহিস্ সালাম তাঁর অন্যান্য বিবিগণকে বলতেন : তোমারা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না ; কেননা, আল্লাহর কসম—তোমাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সাথে শয্যাগ্রহণ অবস্থায় আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। (সুতরাং তাঁর মর্তবা আল্লাহ তা‘আলার নিকট খুবই উচু)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং ছোটদের প্রতি সকল মানুষ অপেক্ষা দয়ালুচিহ্ন ছিলেন।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিগণের সাথে নেহাৎ সরল-সহজ ও সাদা-সিধা আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাদের সাথে কথা, কার্যে ও চরিত্রে উদার নীতি অবলম্বন করে চলতেন। তিনি তাদের সাথে কৌতুক-আনন্দও করতেন। একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)—এর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এতে হযরত আয়েশা অগ্রগামী হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে পুনরায় একবার যখন প্রতিযোগিতা হয়, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। এবার তিনি বললেন : দেখ হে আয়েশা! আমি কিন্তু পূর্বেরটা শোধ করে দিলাম। বিবিদের মনে আনন্দ



আনয়নের জন্য তিনি একরূপ করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি আপন স্ত্রীদের সাথে সর্বজন অপেক্ষা কৌতুকী ছিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হাবাশার কিছু লোক আশুরের দিনে খেলা-ধূলা করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : তুমি কি এদের খেলা-ধূলা দেখবে? আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দু' দিকে দু' হাত দরাজ করে তা ধরে রাখলেন। আমি তাঁর এক হাতের উপর চিবুক রেখে তাদের খেলা দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন : বস বস, এখন শেষ কর। আমি বললাম—না, আরও কিছুক্ষণ দেখবো। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর দু'তিনবার তিনি আমাকে ক্রান্ত করতে বললেন। অবশেষে আরও একবার যখন বললেন, তখন আমি ক্রান্ত করলে তিনি তাদেরকে যেতে বললেন ; তারা চলে গেল।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমস্ত মু'মিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী এবং আপন স্ত্রীদের সাথে সর্বাপেক্ষা অমায়িক ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী।

তিনি বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ وَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي .

“তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তারা যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারে উৎকৃষ্ট। আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারে তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।”

হযরত উমর (রাযিঃ) কঠিন হওয়া সত্ত্বেও বলছেন : তোমরা নিজ গৃহে স্ত্রীদের সাথে শিশুসুলভ মন নিয়ে থাক ; পুরুষোচিত যোগ্যতার যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা দেখাবে।”

হযরত লুকমান (রহঃ) বলেন : “বুদ্ধিমানের উচিত সে যেন ঘরের পরিবেশে বাচ্চার মত থাকে, আর সমাজে পুরুষের ন্যায় থাকে।”

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, “আল্লাহ তা'আলা রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন পায়ণ হৃদয় লোককে পছন্দ করেন না।” এর অর্থ হচ্ছে, যারা আপন স্ত্রীদের সাথে

একরূপ স্বভাবের আচরণ করে এবং মনের দিক থেকে দান্তিক ও অহংকারী হয়।

কুরআনে ব্যবহৃত عَسْت শব্দের মর্মও তাই, অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে রুক্ষ আচরণকারী।

হযরত জাবের (রাযিঃ) জনৈকা বিধবা স্ত্রীলোককে বিবাহ করলে পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন : “তুমি কুমারী কন্যা বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সাথে কৌতুক করতো।”

এক বেদুঈন মরচারীনি স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর তার প্রশংসা করে বলছিল : “গৃহে প্রবেশ করার পর তিনি সদা হাস্যমুখ থাকতেন আর বাইরে—সমাজে তিনি থাকতেন স্বম্পন্ডাভী ও গাভীর অধিকারী। ঘরে যৎকিঞ্চিৎ যা—ই পেতেই খেয়ে নিতেন, ঘরের কোন বস্তু হারিয়ে গেলে তেমন কোন যোগ-জিজ্ঞাসা করতেন না।”

স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারের মধ্যে এটিও একটি যে, খোলা-মেলা, সরলতা ও বিনম্র স্বভাবের আতিশয্যে তাদের বাসনা পূরণে সীমা লংঘন না করা চাই, যার ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তোমার প্রতি ভক্তি-প্রযুক্ত ভয় দূর হয়ে যায়। বরং ন্যায়-পরায়ণ ও মধ্যপন্থী থাকা চাই এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা কায়ম থাকে—একরূপ আচরণ করা চাই। যদি তাদের থেকে শরীয়তের খেলাফ বা ইসলামী রীতি-নীতি বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তবে সাথে সাথে প্রতিবাদ ও শাসন করা চাই।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন : “আল্লাহর কসম, সর্ববিষয়ে যে ব্যক্তি স্ত্রীর কামনা-বাসনার পায়রবী করে, পরিণামে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।”

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন : “অনেক সময় স্ত্রীদের কথা বা পরামর্শের বিপরীত করার মতোই কল্যাণ নিহিত থাকে।”

জনৈক জ্ঞান-তাপসের উক্তি হচ্ছে, স্ত্রীদের সাথে তোমরা পরামর্শ কর, আবার (অনেক ক্ষেত্রে) পরামর্শের বিপরীতও কর।”

হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “স্ত্রী-

বশীভূত পুরুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" এর কারণ হচ্ছে, ক্রমাধ্বয়ে সে তার দাসে পরিণত হয়; অবশেষে স্ত্রীর আজ্ঞাবহ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ধ্বংসের গহ্বরে গিয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে নারীর কর্তা বানিয়েছেন; কিন্তু সে তা উদ্ভিগ্নে দেয়। ফলে, সে শয়তানের অনুসারী হয়, যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا مَرْتَهُ فَيَغَيِّرَتْ خَلْقَ اللَّهِ

“(শয়তান বলে,) আমি তাদেরকে আরও শিক্ষা দিবে, যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয়।” (নিসা : ১১৮)

পুরুষের উচিত ছিল, সে কর্তা হয়ে থাকবে, না অধীন। আল্লাহ পাক পুরুষদের সম্প্রদেহ বলেছেন :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা।” (নিসা : ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফে স্বামীকে ‘সর্দার’ বলে অভিহিত করেছেন, ইরশাদ হয়েছে :

وَالْفِئَاةَ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ

“এবং উভয়ে সেই রমনীর সর্দার (স্বামী)—কে দরজার নিকট দাঁড়ানো অবস্থায় পেল।” (ইউসুফ : ২৫)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন : “তিনটি শ্রেণী এমন রয়েছে যদি তাদের সম্মান কর, তবে তারা তোমাকে হেয় করবে : ১. স্ত্রী, ২. খাদেম (চাকর), ৩. ঘোড়া।” এ উক্তি দ্বারা হযরত ইমামের উদ্দেশ্য হলো, যদি কেবল সম্মান আর সদয় ব্যবহারই করা হয়, সেইসাথে সময় সময় প্রয়োজনে কোনরূপ প্রতিবাদ ও শাসন না করা হয়, তবে পরিণতি এরূপই দাঁড়ায়।

অধ্যায় : ৯৫

## স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

এ সম্পর্কিত মৌলিক ও সারকথা এই যে, বিবাহ-বন্ধন প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব-অধীনতারই একটি প্রকার। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর স্ত্রী স্বামীর জন্যে এক প্রকার আজ্ঞাবহ দাসীরূপ হয়ে যায়। তখন তার কর্তব্য হয়— স্বামীর অভীপ্সিত প্রতি কাজে আনুগত্য করা। তবে শর্ত এই যে, তা কোনরূপ আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপকার্য না হওয়া চাই।

স্বামীর আনুগত্যে স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব— এ সম্পর্কিত প্রচুর রেওয়াজাত হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِيْمًا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে খুশী রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে জাহান্নাতে প্রবেশ করবে।”

এক ব্যক্তি সফরে (প্রবাসে) গমনকালে তার স্ত্রীর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিল যে, সে তার অনুপস্থিতির সময়-কালে উপর (তলা) থেকে নীচে অবতরণ করবে না। নীচে স্ত্রীর পিতা অবস্থান করতেন। একদা তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। নীচে নেমে পিতাকে দেখা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য অনুমতি চেয়ে স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠালো। তিনি বললেন : তাকে বল, সে যেন স্বামীর অনুগতই থাকে। এরপর পিতা মারা যান। পুনরায় অনুমতি চেয়ে লোক পাঠালে ছয়র বললেন : তাকে বল, সে যেন স্বামীর অনুগতই থাকে। অতঃপর পিতার দাফনকার্য সম্পন্ন হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, “স্বামীর আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা

তোমার পিতাকে মাফ করে দিয়েছেন।" (বিধানটি স্বতন্ত্র ; কেননা ক্ষেত্রবিশেষে এ হুকুমের তারতম্যও হতে পারে।)

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ  
فَرْجَهَا وَاطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ جَنَّةَ رَبِّهَا.

“যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, আপন সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর বাধ্য থাকে—সে তার প্রভুর জাহ্নামে প্রবেশ করবে।”

প্রাধান্যযোগ্য যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর বাধ্যতার বিষয়টিকে ইসলামের বুনিনাদী বিষয়াবলীর সাথে উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রসঙ্গে বলেছেন :

حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مَّرِيضَاتٌ رَجِمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ نَوَلَا مَ  
بَاتَيْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مَصْلِيَّتُهُنَّ الْجَنَّةَ

“গর্ভধারীনি স্ত্রীলোক, সন্তানের মা, সন্তানকে দুধ পান করানোর কষ্ট স্বীকারকারীনি, সন্তানের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শনকারীনি—এরা যদি স্বামীর প্রতি অবাধ্যতার আচরণ না করে, যা সাধারণতঃ করে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে নিয়মিত নামাযী মহিলারা অবশ্যই জাহ্নামে প্রবেশ করবে।”

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ فَقُلْتُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ يَكْثُرَنَّ اللَّعْنُ وَيَكْفُرَتِ الْعَشِيرُ.

“আমি জাহ্নামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি ; দেখি— সেখানের অধিকাংশ অধিবাসী নারী সমাজ। তারা জিজ্ঞাসা করলো : কেন এমন হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তারা অতি মাত্রায় অভিশাপ বর্ষণ করে এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।”

অন্য এক রেওয়াজাতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “আমি জাহ্নামে দৃষ্টিপাত করেছি ; দেখি— নারী সমাজ সেখানে খুবই কম। (বর্ণনাকারী বলেন :) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন : স্বর্ণ ও যাকরান (রঙ্গিন পোষাক) এ দুই লালের আকর্ষণ ও মোহ তাদেরকে বিমুখ করে রেখেছে।”

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন : একজন যুবতী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এখন উঠতি বয়স ; বিয়ের জন্যে আমার পয়গাম আসছে ; কিন্তু আমি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে অপছন্দ করছি। আপনি বলুন— স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি রয়েছে? তিনি বললেন : আপাদমস্তক স্বামীর শরীর পীড়িত হয়ে যদি পূজে ভরে যায় আর স্ত্রী তার সেবা-গুশ্রায আপন জিহ্বা দ্বারা লেহন করে, তবু তার কৃতজ্ঞতা আদায় হবে না। মেয়েলোকটি বললো : তাহলে কি আমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না, তুমি বিবাহ বস ; কারণ এতেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, খাস্‌আম গোত্রের এক মহিলা হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একজন বিধবা স্ত্রীলোক ; আমার বিবাহ বসার ইচ্ছা আছে, আপনি বলুন— স্বামীর হুক কি? তিনি বললেন : স্ত্রীর উপর স্বামীর হুক হচ্ছে, সে যখন তার স্ত্রীকে শয্যায়া আহ্বান করে, তখন সে উঠের পিঠে উপবিষ্ট থাকলেও যেন তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। স্বামীর আরও হুক হচ্ছে যে, তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী গৃহের কোন বস্তু কাটকে দিবে না। যদি দেয় তবে গুনাহ্ স্ত্রীর হবে আর সওয়াব স্বামীর হবে। স্বামীর আরেকটি হুক হচ্ছে, তার অনুমতি ব্যতীত

শ্রী নফল রোযা রাখবে না। যদি এরূপ করে তবে এটা অযথা পানাহার থেকে বিরত থেকে কষ্ট করা হবে ; কোনরূপ সওয়াব হবে না। শ্রী যদি স্বামীর অনুমতি বতীত ঘর থেকে বের হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَوَأَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِرِجُلٍهَا.

“আমি যদি অন্য কাউকে সেজদা করতে আদেশ করতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে।” কারণ শ্রীদের উপর স্বামীদের হক গুরুতর।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন : শ্রীলোকেরা আল্লাহ তা‘আলার একান্ত নিকটতর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন তারা আপন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত তাদের নামায মসজিদে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহের অন্দর কুঠরীতে আদায়কৃত নামায (সাধারণ) গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম।” পর্দার হেফযতের জন্যই এ হুকুম হয়েছে। এ জন্যই তিনি ইরশাদ করেছেন : “শ্রীলোক স্বয়ং পর্দা ; ঘর থেকে বের হলেই শয়তান উকি-ঝুকি মারতে থাকে।”

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন : “শ্রীলোকের পর্দা এগারটি ; বিবাহের পর স্বামী তার জন্যে একটি পর্দা ; মৃত্যুর পর কবর তার জন্যে দশটি পর্দা।”

মোটকথা, শ্রীর উপর স্বামীর অনেক হক রয়েছে ; ভ্রমধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে দুটি :- এক, আপন সতীত্বরক্ষা ও পর্দা পালন। দুই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্বামীর কাছে দাবী না করা।

আদর্শ পূর্বসূরীগণের নীতি ছিল, তাদের কেউ যখন জীবিকার জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন তাদের শ্রী-কন্যাগণ বলতেন : অবৈধ উপার্জন

থেকে বেঁচে চলবেন ; আমার “ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে নিবো। তবুও দোষখের আগুন সহ্য করতে পারবো না।”

তাদেরই মধ্যকার একজনের ঘটনা— একদা সফরের এরাদা করলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার এ সফর কামনা করছিল না ; তারা সে লোকের শ্রীকে বললো : আপনি তার এ সফরে সম্মতি দিচ্ছেন কেন, অথচ তিনি তার অনুপস্থিতিকালীন খরচাদি আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন না? শ্রী জবাব দিলেন : আমি তার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাকে শুধু একজন ভোজন-বিলাসীই পেয়েছি ; রিকিদ্দাতা হিসাবে তাকে পাই নাই, বরং প্রকৃত রিকিদ্দাতা একমাত্র আল্লাহ পাকই ; এ কথার উপর আমি পূর্ণ ঈমান রাখি। তিনি যাচ্ছেন ; যান, কিন্তু আসল রিকিদ্দাতা তো রয়েছেন।

হযরত রাবেয়া বিনতে ইসমাদিল (রহঃ) হযরত আহমদ ইবনে আবী হওয়ালা (রহঃ)—এর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। তাই অসম্মতি প্রকাশ করে জবাব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমার কর্মমগ্নতার (ইবাদত-বন্দেগীর) কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা বাদ দিয়ে রেখেছি। হযরত রাবেয়া বললেন : আমিও আপনার ন্যায় কাজে (ইবাদতে) মগ্ন থাকি ; তদুপরি আমার বিবাহের خواهশও নাই, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী স্বামী থেকে আমি যে প্রচুর সম্পদ পেয়েছি ; আমার ইচ্ছা হয় আপনি সেগুলো আপনার অন্যান্য বন্ধুজন ও তাপসগণের মধ্যে খরচ করুন। আর সে সঙ্গে আমিও তাঁদের পরিচিতি লাভে ধন্য হই। এ ভাবে খোদা-প্রাপ্তির একটি পথ আমার জন্যে হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি বললেন : তাহলে আমার শায়খ-গুরুজনের নিকট পরামর্শ করে নিই। তাঁর শায়খ হযরত আবু সুলাইমান দাররানী (রহঃ) এতকাল তাকে বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন, আর বলতেন : আমাদের লোকদের মধ্যে যারাই বিবাহ করেছে, তাদের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে (অর্থাৎ পার্থিব কামেলায় পড়ে কিছু যিকির-আযকার ও ধ্যান-সাধনা ছেড়ে দিয়েছে)। হযরত সুলাইমান দাররানী (রহঃ) উক্ত মহিলার উক্তি ও অবস্থা জেনে তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি তাকে শ্রীরূপে গ্রহণ করে নাও ; তিনি আল্লাহর ওলী সিদ্দীকীনের ন্যায় উক্তি করেছেন। আহমদ ইবনে আবী হাওয়ালা (রহঃ) বলেন : অতঃপর আমি তাঁকে বিবাহ করে নিলাম। কিন্তু ঘরে আমার

স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না। যদি এরূপ করে তবে এটা অযথা পানাহার থেকে বিরত থেকে কষ্ট করা হবে; কোনরূপ সওয়াব হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি বতীত ঘর থেকে বের হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

হযর আকরাম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَوَامَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرَأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

“আমি যদি অন্য কাউকে সেজদা করতে আদেশ করতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে।” কারণ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক গুরুতর।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন : স্ত্রীলোকেরা আল্লাহ তা‘আলার একান্ত নিকটতর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন তারা আপন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত তাদের নামায মসজিদে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহের অন্তর কুঠরীতে আদায়কৃত নামায (সাধারণ) গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম।” পর্দার হেফামতের জন্যেই এ হুকুম হয়েছে। এ জন্যেই তিনি ইরশাদ করেছেন : “স্ত্রীলোক স্বয়ং পর্দা; ঘর থেকে বের হলেই শয়তান উকি-ঝুকি মারতে থাকে।”

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন : “স্ত্রীলোকের পর্দা এগারটি ও বিবাহের পর স্বামী তার জন্যে একটি পর্দা; মৃত্যুর পর কবর তার জন্যে দশটি পর্দা।”

মোটকথা, স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক রয়েছে; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে দুটি :- এক. আপন সতীত্বরক্ষা ও পর্দা পালন। দুই. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্বামীর কাছে দাবী না করা।

আদর্শ পূর্বসূরীগণের নীতি ছিল, তাদের কেউ যখন জীবিকার জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন তাদের স্ত্রী-কন্যাগণ বলতেন : অবৈধ উপার্জন

থেকে বেঁচে চলবেন; আমরা “ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে নিবো। তবুও দোষখের আগুন সহ্য করতে পারবো না।”

তাদেরই মধ্যকার একজনের ঘটনা— একদা সফরের এরা দা করলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার এ সফর কামনা করছিল না; তারা সে লোকের স্ত্রীকে বললো : আপনি তার এ সফরে সম্মতি দিচ্ছেন কেন, অথচ তিনি তার অনুপস্থিতিকালীন খরচাদি আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন না? স্ত্রী জবাব দিলেন : আমি তার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাকে শুধু একজন ভোজন-বিলাসীই পেয়েছি; রিমিকদাতা হিসাবে তাকে পাই নাই, বরং প্রকৃত রিমিকদাতা একমাত্র আল্লাহ পাকই; এ কথা উপর আমি পূর্ণ ঈমান রাখি। তিনি যাচ্ছেন; যান, কিন্তু আসল রিমিকদাতা তো রয়েছে।

হযরত রাবেয়া বিন্তে ইসমাদিল (রহঃ) হযরত আহমদ ইবনে আবী হওয়ায়ী (রহঃ)—এর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। তাই অসম্মতি প্রকাশ করে জবাব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমার কর্মমগ্নতার (ইবাদত-বন্দেগীর) কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা বাদ দিয়ে রেখেছি। হযরত রাবেয়া বললেন : আমিও আপনার ন্যায় কাজে (ইবাদতে) মগ্ন থাকি; তদুপরি আমার বিবাহের খাশেশও নাই, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী স্বামী থেকে আমি যে প্রচুর সম্পদ পেয়েছি; আমার ইচ্ছা হয় আপনি সেগুলো আপনার অন্যান্য বন্ধুজন ও তাপসগণের মধ্যে খরচ করুন। আর সে সঙ্গে আমিও তাঁদের পরিচিতি লাভে ধন্য হই। এ ভাবে খোদা-প্রাপ্তির একটি পথ আমার জন্যে হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি বললেন : তাহলে আমার শায়খ-গুরুজনের নিকট পরামর্শ করে নিই। তাঁর শায়খ হযরত আবু সুলাইমান দাররানী (রহঃ) এককাল তাকে বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন, আর বলতেন : আমাদের লোকদের মধ্যে যারাই বিবাহ করেছে, তাদের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে (অর্থাৎ পার্থিব ঝামেলায় পড়ে কিছু যিকির-আযকার ও ধ্যান-সাধনা ছেড়ে দিয়েছে)। হযরত সুলাইমান দাররানী (রহঃ) উক্ত মহিলার উক্তি ও অবস্থা জেনে তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নাও; তিনি আল্লাহর ওলী সিদ্দীকীদের ন্যায় উক্তি করেছেন। আহমদ ইবনে আবী হওয়ায়ী (রহঃ) বলেন : অতঃপর আমি তাঁকে বিবাহ করে নিলাম। কিন্তু ঘরে আমার

বসবাস এমন ছিল যে, গোসল করা তো দূরের কথা, খাওয়া-দাওয়ার পর হাত ধোয়ার ফুরসৎ পায় না এমন ব্যক্তির ন্যায় শীঘ্র বের হয়ে আসতাম। পরবর্তীতে আমি আরও বিবাহ করেছি। কিন্তু এই প্রথম স্ত্রী আমাকে উন্নত খাওয়া-দাওয়া করাতে সব সময় উৎফুল্ল রাখতো আর বলতো—যান, সদা আনন্দিত থাকুন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। শ্যাম দেশের এ হযরত রাবেয়া (রহঃ)—এর সেই মর্তবা ছিল, যে মর্তবা ছিল বসরা নিবাসী হযরত রাবেয়া বসুরিয়া (রহঃ)—এর।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে, স্বামীর সম্মতি না জেনে তার সম্পদে কিছুমাত্র এদিক-সেদিক করবে না। হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে, স্ত্রীলোক স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্য কাউকে কিছু খাওয়াবে না। হ্যাঁ, কোন খাদ্যবস্তু বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তা ভিন্ন কথা। স্বামীর অনুমতি নিয়ে কোন অভাবীকে অন্ন দান করলে, স্বামীর সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে। পক্ষান্তরে, বিনা অনুমতিতে এরূপ করলে সে গুনাহগার হবে আর স্বামীর আমলনামায় সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।

কন্যার প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য হচ্ছে, মাতা-পিতা তাদের প্রতিটি কন্যা-সন্তানকে পূর্বাঙ্কেই শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। উন্নত আচার-ব্যবহার ও সুন্দর আচরণনীতি, স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করার প্রয়োজনীয় ও সুন্দর তরতীব ও নিয়ম-পদ্ধতি শিখাবে।

বর্ণিত আছে, হযরত উসামাহ বিনতে খারেজাহ্ ফযাহরী (রাযিঃ) তার কন্যাকে স্বামীর সোপর্ন করার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন : এতদিন তুমি পাখীর বাসার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র পরিসরে অবস্থান করছিলে। এখন তুমি একটি অপরিচিত প্রশস্ত পরিবেশে যাচ্ছ—তোমাকে এমন এক শয্যা গ্রহণ করে নিতে হবে যেটি সম্পর্কে তোমার কোনই পরিচিতি নাই। এমন সাথীকে আপন করে নিতে হবে, যার সাথে পূর্ব থেকে কোনই সম্পর্ক নাই ; সম্পূর্ণ নূতন সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাজেই তুমি তার জন্যে যমীনস্বরূপ হয়ে যাও, সে তোমার জন্যে আসমানস্বরূপ হবে। তুমি তার জন্যে বিছানাস্বরূপ হয়ে যাও, সে তোমার জন্যে সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হবে। তুমি তার বাঁদী হয়ে যাও, সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে। কোন কাজে বা কথায় খোঁচা দিওনা বা

অতিরঞ্জন করো না, সে তোমাকে সরিয়ে দিবে। তুমি তাকে দূরে রেখো না, সে তোমাকে দূর করে দিবে। সে তোমার নিকটবর্তী হলে, তুমি তার আরও নিকটবর্তী হও। আর সে যদি তোমাকে পরিহার করে চলে, তবে তুমি তার থেকে সরে পড়। সর্বদা লক্ষ্য রাখবে— তোমা থেকে সে যেন সব সময় ভাল শুনে, ভাল দেখে, ভাল আঁচ করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত মায়মুনাহ্ (রাযিঃ) হযুরের অনুমতি না নিয়ে নিজের বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। নির্ধারিত দিনে তার নিকট উপস্থিত হয়ে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পেরে বলেছিলেন : “তোমার ভাই-বোনদেরকে যদি বাঁদীটি দান করে দিতে তবে তুমি অধিক সওয়াবের ভাগী হতে।”

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উপদেশ দিয়েছেন : “মার্জনার দৃষ্টি রাখ, তাহলে ভালবাসা স্থায়ী হবে। আমার অসন্তোষের মুহূর্তে নিশ্চুপ থেকো, তাহলে কল্যাণ হবে, ঢেলের ন্যায় আমাকে আঘাত করো না, কারণ, জানা নাই অদৃশ্যের অন্তরালে কি লুকিয়ে রয়েছে। অধিক মাত্রায় অভিযোগ করো না, এতে ভালবাসা হ্রাস পায় ; অন্তর তোমায় অস্বীকার করতে পারে ; অন্তরের উপর আমারও হাত নাই। অন্তঃকরণে আমি যেমন ভালবাসা লক্ষ্য করেছি, তেমনি তাতে শত্রুতাও অবস্থান করে, তবে ভালবাসা শত্রুতাকে দূর করতে সক্ষম।”

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

অধ্যায় : ৯৬

## জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا  
بِمَاؤَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

“পূর্ণ মু’মিন তারাি যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে  
অতঃপর তাতে সন্দেহ করে নাই, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা  
আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে ; তারাি সত্যবাদী। (হুজুরাত : ১৫)

হযরত নু’মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি  
হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বরের নিকট বসা  
ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উক্তি করলো—ইসলাম গ্রহণ করার পর  
হাজীদের খেদমত, তাদের পানি পান করানো, মসজিদুল-হারাম আবাদ করা  
ছাড়া অন্য কোন আমলের আমি প্রয়োজন মনে করি না এবং পরোয়াও  
করি না। অপর একজন বললো ; তুমি যে কাজগুলোর কথা বলেছো,  
সেগুলোর ভুলনায় জিহাদ শ্রেষ্ঠ। হযরত উমর (রাযিঃ) তাদেরকে ধমকের  
স্বরে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বরের কাছে  
বসে তোমরা এতো উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করছো?— এটা ঠিক নয়। বরং  
তোমরা এরূপ করতে পার যে, আজকে জুমার দিন ; নামায শেষ হওয়ার  
পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে  
তোমাদের বিতর্কিত বিষয়টির সমাধান করে নাও। এর পরই আল্লাহর পক্ষ  
থেকে কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় :

اجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ

“তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদে হারামের  
আবাদ রাখাকে সেই ব্যক্তির আমলের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ? যে—  
ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলা ও কিয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, আর  
সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে ; তারা আল্লাহ তা’আলার নিকট সমান  
নয় ; আর যারা অবিচারক আল্লাহ তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।”  
(তওবাহ : ১৯)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও সাহায্যে কেদামসহ বসা  
ছিলাম ; আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং  
আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি তা জানা, অতঃপর সে অনুযায়ী  
আমল করা। তখনই আল্লাহ তা’আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ ۝

“সমস্ত বস্তু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা আসমানসমূহে আছে  
আর যা যমীনে আছে, আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মু’মিনগণ !  
তোমরা এরূপ কথা কেন বলছো, যা কর না? আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত  
অসন্তুষ্টির কারণ যে, এরূপ কথা বল যা কর না। আল্লাহ তো ঐ সমস্ত  
লোককে ভালবাসেন, যারা তার পথে এরূপ মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে, যেন  
তারা একটি অট্টালিকা। (হুফ : ১৪)

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আয়াতখানি তিলাওয়াত করে শুনালেন।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল বাতিলিয়ে দিন, যা করলে আমি জিহাদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করি। হযুর বললেন : এমন কোন আমল আমি দেখি না। অতঃপর (তাকে জিহাদের অধিকতর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য) বললেন : তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ ব্যক্তি যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং কোন রকম ক্রটি না করে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন রকম ক্রটি না করে রোযাদার অবস্থায় থাকবে? সে বললোঃ হযুর! এটা তো বড় কঠিন বরং অসম্ভব ব্যাপার; কে এমন পারবে!

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এক গোত্রের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় স্বচ্ছ পানির একটি সুন্দর ঝর্ণা দেখে বলেছেন : আমি যদি জন-মানবের কোলাহল থেকে পৃথক জীবন যাপন করতাম, তাহলে এখানে এই ক্ষুদ্র গোত্রটির কাছেই আবাস করে নিতাম ; তৎক্ষণাৎ আবার বললেন, না ; এ বিষয়ে হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : এরূপ কখনও করো না, কারণ :

فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا إِلَّا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ يَدْخُلَكُمْ الْجَنَّةَ أَغْرَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَوَاقٍ نَافَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

“আল্লাহর পথে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জিহাদে মগ্ন রয়েছে, বাড়ীতে অবস্থান করে সত্তর বছর ইবাদত করলে যে সওয়াব লাভ হবে, সে ব্যক্তি

তার চেয়ে বেশী সওয়াবের ভাগী হবে। তোমরা চাও না যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং জামাতে প্রবেশ করিয়ে দিন? যদি চাও তাহলে তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি একবার উম্মীর দুধ দোহন পরিমাণ সময় জিহাদ করবে, তার জন্য জামাত অবশ্যভাবী হয়ে যাবে।”

প্রাধান্যযোগ্য যে, এতো উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবীকেও প্রচুর ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার জন্যে যে ক্ষেত্রে লোকারণ্যের বাইরে অবস্থানের অনুমতি দেন নাই ; বরং তাকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে জিহাদ পরিত্যাগ করে চলা আমাদের জন্য কি করে জায়েয হবে? অথচ আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর পরিমাণও খুব কম, হালাল রিযিকের ব্যাপারেও আমরা উদাসীন, তদুপরি নিয়ত ও উদ্দেশ্যও আমাদের খারাব।

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَنْ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الضَّائِرِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّكْعِ السَّاجِدِ.

“খাঁটি নিয়তে আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির মর্যাদা—খাঁটি নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ পাকেই জানেন—রোযাদার এবং খুশু-খুযু সহকারে রুকু, সিজদা ও কিয়ামকারী নামাযী ব্যক্তির ন্যায়।”

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জামাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ হাদীসখানি শুনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)—এর নিকট খুবই ভাল লেগেছে। তিনি আরজ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাদীসখানি পুনরায় ইরশাদ করুন। তিনি পুনরায় শুনালেন এবং বললেন : আরেকটি বিষয় এমন রয়েছে যেটির উপর আমল করলে আল্লাহ তাআলা বান্দার একশতটি দর্জা (পদ-মর্যাদা) বৃদ্ধি করেন, যার প্রতি দুই দর্জার মাঝখানে যমীন থেকে আসমানের দূরত্ব—বরাবর ব্যবধান থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে বিষয়টি কি? তিনি বললেন : জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।”



অধ্যায় : ৯৭

## শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা

এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল : হে আবু সাঈদ (তাঁর উপনাম)! শয়তান কি ঘুমায়? তিনি মৃদু হেসে বললেন : আরে, শয়তান যদি ঘুমাতো, তাহলে আমাদের আরাম হয়ে যেতো; বস্তুতঃ শয়তান তার কাজে এমনই তৎপর যে, কোন মুমিন তার থেকে নিস্তার পায় না। তবে তাকে দুর্বল করা বা দমন করার জন্য উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

হযুর আকরাম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْضِي شَيْطَانَهُ كَمَا يَنْضِي أَحَدُكُمْ  
بَعِيرَهُ فِي سَفَرِهِ.

“প্রকৃত মুমিন সে, যে তার শয়তানকে এমন দুর্বল করে দেয়, যেমন তোমরা সফরে উটকে দুর্বল করে দাও।”

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন : “সত্যিকার মুমিনের শয়তান দুর্বল থাকে।”

হযরত কায়স ইবনে হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন : “আমার শয়তানটি নিজেই আমাকে জানিয়েছে যে, সে যখন আমার ভিতরে প্রবেশ করেছিল, তখন উটের ন্যায় তাজা ও মোটা ছিল; কিন্তু এখন সে চড়ুই পাখীর মত ছোট ও দুর্বল হয়ে গেছে।” আমি তাকে এরূপ হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছে : “তুমি আল্লাহর যিকিরের দ্বারা আমাকে গলিয়ে ফেলেছ।”

সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি আছে, এমন পরহেজগার লোকদের পক্ষে শয়তানকে পরাভূত করা কঠিন কিছু নয়। তারা সাধনারতী

হলে শয়তানের চোর-দরজাগুলো বন্ধ করে সহজেই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ বড় বড় এবং প্রকাশ্য গুনাহের প্রতি ধাবিত হওয়ার শয়তানী পথগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তান কূট-কৌশল অবলম্বন করে অতি সূক্ষ্ম পথে তাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে, যেগুলো বুঝে উঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে, আত্মরক্ষা করতে পারে না। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অন্তরের দিকে শয়তানের জন্য অনেকগুলো প্রবেশপথ রয়েছে, কিন্তু ফেরেশতাগণের জন্য প্রবেশপথ মাত্র একটি। এই একটি পথ অনেকগুলোর মধ্যে সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। অতএব, এ ক্ষেত্রে বান্দার অবস্থা ঘন অন্ধকার রাতের সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে এমন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলছে যেটিতে প্রচুর পৈচানো পথ রয়েছে; যেগুলোর সঠিক দিক নির্ণয় করা সূক্ষ্ম-পরিপক্ব দৃষ্টি এবং দীপ্তিময় সূর্যের আলো ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে সূক্ষ্ম-পরিপক্ব দৃষ্টি হচ্ছে তাকওয়া ও খোদাভীতিময় স্বচ্ছ অন্তঃকরণ আর সূর্যের আলো হচ্ছে কুরআন ও হাদীস-আহরিত সত্যিকার জ্ঞান বা ইলম। এরই মাধ্যমে এ কঠিন ও বন্ধুর পথের পথিক তার সমূহ জটিলতা নিরসনে সক্ষম হতে পারে। নতুবা এ সমস্যার কোন অন্ত নাহি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন : একদা হযরত রাসূল করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রেখা টেনে বললেন : “এটা আল্লাহর পথ।” অতঃপর সেই রেখাটির ডানে, বামে আরও কতকগুলো রেখা টানলেন। এবার বললেন : এগুলোও পথ; কিন্তু এর প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং লোকজনকে সে (ধ্বংস ও বিভ্রান্তির) সে পথগুলোর দিকে আহ্বান করছে। এরপর হযরত নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন :

وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ  
فَتَفْشَرَوْا بِكُمُ عَنْ سَبِيلِهِ ۝

“অবশ্যই এটি আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।” (আনআম : ১৫৩)

শয়তানের সূক্ষ্ম ও গোপন পথসমূহকে অনুধাবন করার জন্য আমরা এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ পেশ করছি। কিভাবে শয়তান বিজ্ঞ আলেম, ইবাদত ওজার ওলী, প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রক ও পাপাচার থেকে বিরত লোকদেরকে পর্যন্ত কাত করে ফেলে, উদাহরণটি দ্বারা এ বিষয়টি প্রতিভাত হবে। হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল গোত্রে এক পাদ্রী ছিল। একদা ইবলীস শয়তান তাকে প্রভারিত করার জন্য ফন্দি আঁটলো। এক বাড়ীতে এসে একটি যুবতী মেয়ের গলা টিপে ধরে। তাতে সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর শয়তান বাড়ীর লোকদের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিলো যে, পাদ্রীর নিকট এই রোগীনির অব্যর্থ চিকিৎসা-তদবীর রয়েছে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, তাকে আপনার নিকট রাখুন। পাদ্রী নিজের হেফাজতে তাকে রাখতে অস্বীকার করলো। কিন্তু অভিভাবকদের বার বার অনুরোধে অবশেষে রাজী হয়ে গেল এবং মেয়েটিকে নিজ হেফাজতে রেখে চিকিৎসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে কুমন্ত্রনা দিতে লাগলো। ফলে, পাদ্রী মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবে একদিন সে পাদ্রী কর্তৃক গর্ভধারণ করলো। অতঃপর শয়তান পাদ্রীর মনে এই মর্মে ওয়াসুওয়াসাহ সৃষ্টি করলো যে, তার অভিভাবকদের নিকট তুমি কি জবাব দিবে; তারা এসে যখন দেখবে তাদের মেয়ে গর্ভধারণ করেছে, তখন তারা তোমাকেই দায়ী করবে, এভাবে তুমি তোমার মান-সম্মান সবই হারাবে। সুতরাং শয়তান তাকে উপায় শিখিয়ে দিল যে, এখন তুমি মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির নীচে পুতে ফেল, এভাবে তোমার সব সমস্যা চুক যাবে; অভিভাবকরা এসে পুতে ফেল, এভাবে তোমার সব সমস্যা চুক যাবে; অভিভাবকরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে—সে মারা গেছে। পাদ্রী তাই করলো। এদিকে শয়তান অভিভাবকদের নিকট এসে তাদের মনেও এ বিষয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করলো। তারা এসে পাদ্রীর নিকট মেয়েটির খোঁজ নিল। পাদ্রী বললো, সে মারা গেছে। এ কথা শুনে তারা মোটেই বিশ্বাস করলো না; পাদ্রীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করার জন্য শুলিতে নিয়ে গেল। এ সময় শয়তান তার নিকট হাজির হয়ে বললো : তুমি আমাকে চিন? আমি নিজেই মেয়েটির গলা টিপে ধরেছিলাম, তার অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরে ওয়াসুওয়াসাহ ঢেলেছিলাম। এখন যদি তুমি এহেন বিপদ থেকে

রক্ষা পেতে চাও, তবে আমার কথা শুনে। পাদ্রী বললো : তোমার কথা কি? শয়তান বললো : খুবই সহজ; তুমি শুধু আমাকে দুটি সিঁদুর দাও। পাদ্রী কোন উপায়ান্তর না দেখে শয়তানকে সিঁদুর করে কাফের হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান পাদ্রীকে উপহাস করতে করতে পলায়ন করলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ই ইরশাদ করেছেন :

كَمَثَلَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ  
قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ

“এরা শয়তানের ন্যায়, যে শয়তান মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়ে সারে তখন শয়তান বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।” (হাশর : ১৬)

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইবলীস হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে প্রশ্ন করেছিল—এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করছেন, অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বেহেশত দিবেন, নতুবা দোযখে নিক্ষেপ করবেন; সবই দেখি তারই ইচ্ছা—এটা কি কোন ইনসাফ বা ন্যায্যনাগুণ কাজ হলো, না তিনি জুলুম করলেন; ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একটু চিন্তা করে বললেন : “সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তো এটা অবশ্যই জুলুম হবে, আর যদি তিনি তাঁর নিজস্ব মজী অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে স্মরণ রাখ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে সকল প্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।” এ কথা শুনে শয়তান বিফল-বিমুখ হয়ে পলায়ন করলো এবং বলতে থাকলো—“হে শাফেয়ী! এই একটি মাত্র প্রশ্নের দ্বারা আমি সত্তার হাজার আবেদ ও খোদাতীক লোককে গোমরাহ করেছি এবং উবুদীয়তের খাতা হতে তাদের নাম কাটিয়ে দিয়েছি।”

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইবলীস হযরত ঈসা (আঃ)—এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : হে নবী! আপনি বলুন ও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’। হযরত ঈসা (আঃ) জবাব দিলেন : এটা সত্য কলোমা; কিন্তু তোর হুকুমে

আমি তা পড়বো না। এর কারণ হচ্ছে যে, ইবলীস শয়তান অনেক সময় ইবাদত ও নেক কাজের মাধ্যমেও ধোকায ফেলে। আর এরই মাধ্যমে সে অদ্যাবধি বহু আবেদ, যাহেদ, বিস্তশালী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে ধোকায ফেলে ধ্বংস করেছে। আল্লাহ্! পাক যাকে হেফাজত করেন সেই মাহফুজ থাকতে পারে। আয় আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তানের ধোকা-প্রতারণা হতে হিফাজত করুন ; আপনার সাথে মোলাকাতের তওফীক নসীব করুন এবং হেদায়াতের উপর কায়ম-দায়েম রাখুন।

## অধ্যায় : ৯৮

### সামা'

[ 'সামা' আরবী শব্দ ; অর্থ : শ্রবণ করা। অভিধানে সঙ্গীত অর্থেও উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকেই এক শ্রেণীর মুর্খ ও ভণ্ড লোক গীত-বাদ্য ও নর্তন-কর্দন জায়েয বলে প্রচারের সুযোগ নিয়েছে। অথচ, অধুনা প্রচলিত কাওয়ালী, মুশিদী গান বা অশ্লীল নৃত্য-গীত, ক্রীড়া-কৌতুক ও বাদ্যানুষ্ঠানের সাথে সামার কোনই সম্পর্ক নাই ; এগুলো সম্পূর্ণ হারাম। ]

কাজী আবু তাহিয়্যাব তবরী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা, হযরত সুফিয়ান সওরী রাহেমাছমুলাহ ও অন্যান্য ফকীহগণের এক জামাত থেকে যেসব উক্তি নকল করেছেন, সেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা (প্রচলিত) সামাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তদীয় 'আদাবুল-কাজী' গ্রন্থে লিখেছেন : “নিঃসন্দেহে গান-বাজনা বাতিলের অন্তর্ভুক্ত, বেহুদা এবং অবশ্য হারাম কাজ ; নির্বোধ ছাড়া এহেন গর্হিত বিষয় কেউ শুনতে পারে না ; এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।”

কাজী আবু তাহিয়্যাব (রহঃ) বলেন : “গায়ের মাহরাম (যার সাথে পর্দা করতে হয়) স্ত্রীলোকের সামা' শ্রবণ করা ইমাম-শাফেয়ী ও তাঁর বিজ্ঞ ফকীহ শাগরেদগণের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম—চাই স্ত্রীলোক সামনে উপস্থিত হোক বা পর্দার অন্তরালে হোক কিংবা আযাদ হোক অথবা বাদী হোক; সর্বাবস্থায়ই হারাম। তিনি বলেন : ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)—এর উক্তি, হচ্ছে—কোন বাদীর কাছ থেকে সামার জন্য যদি লোকজন একত্রিত হয়, তবে সেই বাদীর মালিক এমন নির্বোধ বলে সাব্যস্ত হবে যে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন : সাধারণ একটি দণ্ড হাতে নিয়ে ডুগুড়ুগি বাজানোও জায়েয নয় ; কারণ, এগুলো দীন-বিত্তের লোকদের উদ্দেশ্যমূলক আবিষ্কার ; তারা চায়—এগুলোর মধ্যে

মস্ত হয়ে মানুষ কুরআন তিলাওয়াত ও আসল উদ্দেশ্যের বিষয়ে গাফেল হয়ে যাক।”

হযরত ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন : হাদীসের দৃষ্টিতে নারদ বা তাস-পাশা খেলা অন্যান্য খেলার তুলনায় অধিকতর জঘন্য কাজ ; এবং আমি শত্রুঞ্জ-দাবা খেলাকেও ঘৃণা করি ; সর্ববিধ ক্রীড়া-কৌতুককেই আমি অপছন্দ করি। কেননা, এহেন মস্ততা কোন দীনদার লোকের চরিত্র হতে পারে না ; এমনকি কোন ভদ্র লোক এগুলো খেলতে পারে না।”

ইমাম মালেক (রহঃ) গান বা সঙ্গীত থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন : কেউ একটি বাদী খরিদ করার পর যদি জানতে পারে যে, এটি গায়িকা, তবে (এটা এমন একটা দোষ যে এজন্যে) সে বাদীটিকে বিক্রোতার নিকট ফেরৎ দিতে পারবে (এবং বিক্রোতা তা ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবে)। মদীনা মোনাওয়ারার সকল ফকীহগণেরও একই অভিমত।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট গান গুনাহের কাজ। ‘কুফা’বাসী সমস্ত ফকীহ ও ইমামগণের একই অভিমত—হযরত ইব্রাহীম নখ্বী হযরত শায়বী (রহঃ) প্রমুখের এই মস্তব্য ও অভিমত কাজী আবু তাইয়্যিব তব্রী (রহঃ) নকল করেছেন।

অধ্যায় : ৯৯

## বিদআত ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত থাকা

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ  
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

“দীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা বিষয়সমূহ হতে তোমরা বেঁচে চল। কেননা, এরূপ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।”

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন :

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِ دِينِنَا هَذَا مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করেছে (যা এতে নাই), সে কথা রদ্ বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।”

আরও ইরশাদ হয়েছে :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي

“তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পর সংপথ-প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধর।”

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা জানা গেল যে, যে কোন বিষয় কুরআন, সুন্নাহ্ এবং আয়েশ্বায়ে কেরামের ইজ্জাম’র খেলাফ হবে, সেটাই বিদআত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ  
بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ  
عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের বুনিয়াদ রাখলো, সে জন্যে তার সওয়াব রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের সওয়াবও সে পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের বুনিয়াদ রাখলো, সে জন্যে তার পাপ রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী চলবে, তাদের পাপও সে পাবে।”

হযরত কাতাদাহ্ (রাযিঃ) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۝

“নিঃসন্দেহে আমার এ সোজা পথ ; তোমরা এর অনুসরণ কর।”

(আনুআম : ১৫৩)

তিনি বলেছেন : “সঠিক পথ একটিই ; আর এটিই একমাত্র হেদায়াতের পথ—এ পথেরই পরিণামফল জাম্বাত।”

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেছেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বুঝানোর জন্যে আপন মোবারক হস্ত একটি রেখা টেনে বলেছেন : এটি আল্লাহ্ তা‘আলার সরল পথ। অতঃপর এর ডানে—বামে রেখা টেনে বলেছেন : এগুলোও পথ ; কিন্তু তা শয়তানের পথ এবং প্রত্যেকটি পথে শয়তান বসে মানুষকে বিপথে ডাকছে। অতঃপর (উপরোক্ত) আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) উক্তি করেছেন : “এগুলো হচ্ছে গুমরাহীর পথ।”

হযরত ইবনে আতিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন : “ভুল ও ভ্রান্ত পথ যেগুলো হাদীসে দেখানো হয়েছে, সেগুলো দ্বারা ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ, ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মবাদ এবং বিদআতী ও গুমরাহ্ লোকদের পথকে উদ্দেশ্য করা

হয়েছে, যে সব বিদআতী ও গুমরাহ্ লোকেরা নিজেদের চিন্তা-কল্পনা ও বে-লাগাম ইচ্ছানুযায়ী ধ্বিনের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াবলীর পরিবর্তন করে এবং শররী বিষয়ে অযথা তর্ক-বিতর্ক ও ভ্রান্ত গবেষণা ও আহরণে লিপ্ত হয়।”

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي -

“আমার সুন্নতের বিষয়ে যে ব্যক্তি অনাগ্রহী হয়েছে, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে :

مَا مِنْ أُمَّةٍ ابْتَدَعَتْ بَعْدَ نَبِيِّهَا فِي دِينِهَا بِدْعَةً إِلَّا  
أَضَاعَتْ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ -

“যে কোন উম্মত তাদের নবী কর্তৃক আনীত ধ্বিনের মধ্যে মনগড়াভাবে নতুন কোন (বিদআত) বিষয় সৃষ্টি করেছে, ঠিক সেই অনুপাতে তারা অপর একটি সুন্নত ধ্বংস করেছে।”

আরও ইরশাদ হয়েছে :

مَا تَحَتَّ ظِلُّ السَّمَاءِ مِنْ إِلَهٍ يُعْبَدُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ  
مِنْ هَوًى يُتَّبَعُ

“আকাশের নীচে বাতিল পূজনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে প্রবৃত্তি অপেক্ষা বড় আর কোনটি নাই।”

অর্থাৎ ধ্বিনের মোকাবিলায় প্রবৃত্তির অনুসরণ জঘন্যতম অপরাধ।

হযরত আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহ্ বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মদের পন্থা। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা ধ্বিন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এরূপ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই (বিদআত গুমরাহী)।”

এ হাদীসেরই শেষাংশটি হচ্ছে :

إِنَّمَا أَحْسَنَىٰ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغِيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفَرْجِكُمْ  
وَمُضَلَّتِ الْهُوَىٰ-

“তোমাদের ব্যাপারে আমার ঐসব কাম-প্রবৃত্তিগত বিষয়ে ভয় হয়, যেগুলো তোমাদের পেট, লজ্জাস্থান ও মনের বে-লাগাম তাড়নার সাথে সম্পর্কিত।”

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ حَبَبَ التَّوْبَةِ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ حَتَّىٰ  
يَدَعَ بِدْعَتَهُ-

“বিদআতী ব্যক্তি যে পর্যন্ত বিদআত-কার্য ত্যাগ না করে, আল্লাহ তা’আলা তাকে তওবার তওফীক দেন না।”

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা’আলা বিদআতী ব্যক্তির রোযা, হজ্জ, উমরাহ, জিহাদ, কোন ফরজ ইবাদত কিংবা কোন নফল ইবাদত কবুল করেন না। ইসলাম থেকে সে এমনভাবে বের হয়ে যায় যেমন গোলা আটা থেকে চুল বের হয়ে আসে।

لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كُنْهَاهَا لَا  
بَرِيعَ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ لِكُلِّ عَمْرَةٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ  
فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَىٰ سُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَىٰ وَ  
مَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

“আমি তোমাদেরকে (দ্বীনের বিষয়ে) একটি স্বেচ্ছ-শুভ আলোকিত পথের উপর রেখে যাচ্ছি ; যার রাতও দিবাভাগের ন্যায় উজ্জ্বল। নিজেই ধ্বংস হতে চায় এমন লোক ছাড়া এতে কেউ পদস্খলিত হবে না। প্রতিটি মানুষের জীবনে কর্মক্ষমতা রয়েছে, আর এ কর্মক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ ও অবকাশও দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এ সুযোগ ও অবকাশ আমার স্মৃত ও আদর্শের অনুসরণে লাগাবে, সেই সঠিক ও সুপথ-প্রাপ্ত হবে, আর যে অন্য কিছুতে লাগাবে, সে বিচ্যুত ও ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে।”

আরও ইরশাদ হয়েছে : “আমার উন্মত্তের জন্য তিনটি বিষয়কে আমি বড় ভয় করি এক, আলোমের পদস্খলন, দুই অনুসৃত প্রবৃত্তি, তিন জালেমের শাসন।”

### খেলা ও খেলার সরঞ্জাম

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নিজ বন্ধুকে বললো : আস, জুয়া খেলি (সে পাপ করলো অতএব ক্ষমার জন্য) সে যেন সদকা করে।

মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নারদ (তাস-পাশা) খেলে, সে যেন আপন হাত শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করলো।

মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “যে ব্যক্তি নারদ (তাস) খেলে, আবার উঠেই নামাযে দাঁড়ায়, তার উদাহরণ হচ্ছে, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে পূজ এবং শূকরের রক্ত দ্বারা উষ্ম করে নামায আদায় করলো।” অর্থাৎ তার নামায কবুল হবে না, যা অন্য রেওয়াজে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইয়াহুয়া ইবনে কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ; তারা তাস-পাশা খেলছিল। তখন তিনি বলেছেন : “এদের অন্তঃকরণ উদাসীন, হাতগুলো অহেতুক ফুয়ুল কাজে

লাগানো হচ্ছে আর জিহ্বাগুলো বেহুদা কথাবার্তা বলছে।”

দীলামী (রহঃ) রেওয়ামাত করেন, হুযর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “যখন তোমরা হার-জিতের তীর খেলা, দাবা, পাশা বা অনুরূপ (অবৈধ) কোন খেলায় রত লোকদের পাশ দিয়ে যাও, তখন তোমরা তাদের সালাম দিও না এবং তারা তোমাদের সালাম করলে জওয়াব দিও না।”

তিনি আরও ইরশাদ করেন : “তিন ধরণের খেলা জাহেলিয়ত-যুগের ‘মাইসিরের (জুয়া) অন্তর্ভুক্ত : কেমার (জুয়া), পাশা, কবুতর বাজী।”

হযরত আলী (রাযিঃ) একদা শতরঞ্জ (দাবা) খেলায় মত্ত এক দল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন : এগুলো আবার কোন মূর্তি যে, তোমরা এর উপর ঝুকে রয়েছ, দাবা-শতরঞ্জ খেলে হাত কলুষিত করা অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গার ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত হাতে রাখা উত্তম।” আরও বলেছেন : “আল্লাহর কসম, তোমরা অন্য কাজের জন্য স্টেট হয়েছো।”

হযরত আলী (রাযিঃ) আরও বলেন : দাবা-শতরঞ্জ খেলোয়াড় অধিকতর মিথ্যুক হয়। কেউ বলে : মেরে ফেলেছি ; অথচ সে মারে নাই। কেউ বলে : মরে গেছে ; অথচ মরে নাই। (অর্থাৎ একেবারে নিরর্থক ও বেহুদা কথা।)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন : “একমাত্র পাপী লোকেরাই দাবা-শতরঞ্জ খেলে থাকে।”

জেনে রাখ—উদ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র), তানপুরা, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সংযোগে গান-বাজনা ও খেলা-ভামাশা করা যেগুলো আনন্দ-উল্লাস ও উত্তেজনা আনয়ন করে এসব হারাম। আল্লাহ্ পাক বৈধে চলার তওফীক দান করুন।

অধ্যায় : ১০০

## রজব মাসের ফযীলত

‘রজব’ শব্দটি আরবী تَرْجَب (তারজীব) হতে নির্গত। অর্থ, সম্মান প্রদর্শন। এ মাসকে আসাব্ব (الْأَصْب : প্রচণ্ড উজ্জ্বাস)-ও বলা হয়। কেননা, এ মাসে তওবাকারীদের প্রতি আল্লাহর প্রচুর রহমত বর্ষিত হয় এবং ইবাদতগুজার বান্দাদের উপর কবুলিয়াতের নুর ও ফয়েজ-বরকত নাযিল হয়। এ মাসকে আসাম্ম (الْإِسْم : বধির)-ও বলা হয়। কেননা, এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার দরুন এ সম্পর্কিত কোন কিছু শুনা যেতো না। কেউ কেউ বলেছেন, বেহেশতে ‘রজব’ নামে একটি ঋণী আছে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা—এই পানি পান করার সুযোগ একমাত্র সেই ব্যক্তিরই পাবে, যে রজব মাসে রোযা রাখে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “রজব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস এবং রমযান আমার উম্মতের মাস।”

তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে তিন অক্ষর-বিশিষ্ট রজব (رَجَب) শব্দটির ✓ রহমতের, ج জুরম্ অর্থাৎ বান্দার গুনাহের এবং ب বারুর অর্থাৎ অনুগ্রহের সংকেত বহন করে। যেন আল্লাহ্ পাক বলেছেন—أَجْعَلْ جَزْمَ عَبْدِي بَيْنَ دَحْقِي وَبَرِي (আমি আমার বান্দার গুনাহকে আমার রহমত ও অনুগ্রহের মাঝখানে রাখি)।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখে রোযা রাখবে, তার আমলনামায় ষাট মাসের রোযার সওয়াব লিখা হবে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম হযরত

জিব্বারদিল (আঃ) রজবের এই সাতাইশ তারিখেই নুবুওয়তের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন।

হুযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “আল্লাহর এই রজব-আসাম্ম মাসে একদিনও যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে রোযা রাখবে, সে আল্লাহ তা‘আলার চরম সন্তুষ্টি লাভ করবে।”

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা‘আলা বছরের মাসগুলোকে চারটি মাসের দ্বারা সৌন্দর্য দান করেছেন—যিল-কদ, যিল-হজ্জ, মুহররম ও রজব। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে : **مِنْهَا رَجُوعُكُمْ** তন্মধ্যে তিনটি একাধারে আর একটি ভিন্ন! আর এই ভিন্ন-স্বতন্ত্র মাসটি হচ্ছে রজব মাস।”

কথিত আছে, এক মহিলা রজব মাসে প্রতিদিন বায়তুল-মুকাদ্দাস মসজিদে বার হাজার বার সূরা ‘কুল হুওয়াল্লাহু’ পাঠ করতো। তার অভ্যাস ছিল রজব মাসে সে নিয়মিত পশমের কাপড় পরিধান করতো। একদা সে অসুস্থ হয়ে যায় এবং পুত্রকে সে ওসীয়াৎ করে যে, মৃত্যুর পর তার পশমের পোষাকটিও যেন তার সাথে দাফন করে দেয়। কিন্তু পুত্র সেই ওসীয়াৎ পালন না করে মৃত্যুর পর তাকে উৎকৃষ্ট কাপড়ে দাফন করেছে। অতঃপর সে একরাতিতে স্বপ্ন দেখলো— মা পুত্রকে বলছে, “আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, তুমি আমার ওসীয়াৎ পালন কর নাই।” পুত্র চিন্তাশ্রিত হয়ে মার পশমের লেবাসখানি কবরে রাখার জন্য আবার কবর খুঁড়লো, কিন্তু কি আশ্চর্য! মা কবরে নাই। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়ায আসলো— ওহে! তুমি কি জাননা; রজব মাসে যে আমার ইবাদত করে আমি তাকে নির্জন একাকীত্বে ফেলে রাখি না?”

বর্ণিত আছে, যারা রজব মাসে রোযা রাখে, তাদের গুনাহ্মাফীর জন্য ফেরেশতাকুল রজবের প্রথম জুম্মা-রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দো‘আয় মগ থাকেন।”

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি হারাম মাসে (যিল-কদ, যিল-হজ্জ, মুহররম ও রজব) তিন দিন রোযা রাখবে, তার জন্য নয় বৎসর ইবাদতের সওয়াব লিখা হবে।” হযরত আনাস বলেন, “বর্ণনাটি আমি নিজ কর্ণে হুযর থেকে শুনেছি। নতুবা আমার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক।”

হিকমত : আল্লাহর সম্মানিত মাস যেমন চারটি, তেমনি শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার সংখ্যাও চার। তেমনি শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের সংখ্যাও চার। তেমনি উযুর (ফরয) অঙ্গও চারটি। এমনিভাবে শ্রেষ্ঠ তাসবীহের কালেমাও চারটি, অর্থাৎ,—

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**

এমনিভাবে অংকের মূল স্তম্ভের সংখ্যাও চার, অর্থাৎ— একক, দশক, শতক, হাজার। অনুক্রম, সময় গণনার বড় বড় অংশও চারটি, যথা ঃঘণ্টা, দিন, মাস, বছর। বছরের ঋতুও চারটি ঃ শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত। এমনিভাবে রোগ-ব্যাধির মৌলিক উৎসও চারটি, যথা ঃ রক্ত, পিত্ত, অন্ন, প্লেজমা। খোলাফায়ে রাশেদীনের সংখ্যাও চার ঃ আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

ইমাম দীলামী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “আল্লাহ তা‘আলা চারটি রাতে প্রচুর পরিমাণে রহমত নাযিল করেন ঃ এক, ঈদুল আযহার রাতে। দুই, ঈদুল ফিতরের রাতে। তিন, অর্ধেক শাবানের রাতে। চার, রজবের রাতে।

ইমাম দীলামী (রহঃ) হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়াযাত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : পাঁচটি রাত্র এমন রয়েছে, যেগুলোতে কেউ দো‘আ করলে তা রদ (ফেরৎ) হয় না ঃ এক, রজব মাসের প্রথম রাত্রি। দুই, শাবান মাসের অর্ধেকের রাত্রি (১৪ই শাবানের দিবাগত রাত্রি)। তিন, জুম্মা‘র রাত্রি। চার ও পাঁচ, ‘দুই ঈদের রাত্রি।”



অধ্যায় : ১০১

## শা'বান মাসের ফযীলত

‘শা'বান’ (شَعْبَان) অর্থ শাখা-প্রশাখা বের হওয়া। এ মাস প্রচুর কল্যাণ ও নেকীর মাস। তাই, এর নামকরণ হয়েছে ‘শা'বান’। আরেক অর্থে ‘শা'বান’ (شَعْبَان) থেকে নির্গত, পাহাড়ে যাওয়ার পথ) কল্যাণের পথ।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, যখন শা'বান মাস উপস্থিত হতো, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : “এ মাসে তোমরা তোমাদের অন্তরকে পাক-পবিত্র করে নাও এবং নিয়তকে সঠিক করে নাও।”

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় একাধারে এতো অধিক রোযা রাখতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনও এমন হতো যে, একাধারে তিনি রোযা রাখছেন না, তখন আমরা মনে করতাম ; তিনি আর রোযা রাখবেন না। তাঁর অধিকাংশ রোযা হতো শাবান মাসে।”

হযরত উসামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শা'বান মাসে আপনাকে যত অধিক সংখ্যায় রোযা রাখতে দেখি, তত অন্য মাসে দেখি না, এর কারণ কি? তিনি বললেন : এ (শা'বান) মাস রজব ও রমযানের মাঝখানের (ফযীলতময়) মাস ; অথচ লোকেরা এ মাসের ব্যাপারে উদাসীন। মানুষের আমলসমূহ এ মাসে রাক্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করা হয়। আমার আমল যখন পেশ করা হয়, তখন রোযা অবস্থায় থাকা আমি পছন্দ করি।”

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া কখনও পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখি নাই এবং শা'বান মাসে যত

অধিক সংখ্যায় রোযা রেখেছেন, তেমন অন্য কোন মাসে দেখি নাই।”

এক রেওয়াজাতে আছে— “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা শা'বান মাস রোযা রাখতেন।” মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে— “তিনি স্বপ্ন সংখ্যক দিন ব্যতীত পুরা শা'বান মাস রোযা রাখতেন।”

বস্তুতঃ এ দ্বিতীয় রেওয়াজাতটি প্রথম রেওয়াজাতের জন্য ব্যাখ্যাবল্লপ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে এতো বেশী রোযা রাখতেন যেন পুরা মাসটিকে ঘিরে নিতেন। সুতরাং ‘পুরা মাস’— এর দ্বারা এখানে ‘অধিকাংশ’—কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, মুসলমানদের জন্য দুনিয়াতে যেমন দুটি ঈদের দিন আছে, তেমনি ফেরেশতাদের জন্যেও আসমানে দুটি ঈদের রাত্রি আছে। মুসলমানদের জন্য ঈদুল-ফিতর ও কুরবানীর ঈদ আর ফেরেশতাদের জন্য শবে বরাত ও লাইলাতুল-কদর। এ জন্যেই শবে বরাত—কে ‘ঈদুল-মালারিকাহ’ নাম দেওয়া হয়েছে।”

ইমাম সুবকী (রহঃ) তদীয় তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শবে-বরাতে ইবাদত করার ওসীলায় বছরের গুনাহ মাফ হয় আর জুম'আর রাতে ইবাদতের ওসীলায় সপ্তাহের গুনাহ মাফ হয় এবং শবে কদরে ইবাদত করলে জীবনের গুনাহ মাফ হয়। এ জন্যেই শবে-বরাতকে গুনাহ-মাকীর রাত্রিও বলা হয়। অনুরূপ, এ রাত্রিকে ‘হায়াত বা ‘জীবনের রাত্রি’ও বলা হয়। ইমাম মুনিরী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস নকল করেছেন— “যে ব্যক্তি দুই ঈদের দুই রাত্রি এবং অর্ধ শা'বানের রাত্রি জেগে ইবাদত করবে, তার অন্তর সে দিনও (কিয়ামতের দিন) মরবে না, যেদিনটি অন্তরসমূহের মৃত্যুর দিন হবে।”

এ রাত্রিকে ‘শাফাযাতের রাত্রি’ও বলা হয়। হাদীস শরীফে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য ১৩ই শা'বানের রাত্রি সুপারিশ করেছিলেন, তাতে কবুল হয়েছিল এক তৃতীয়াংশ, অতঃপর ১৪ই শা'বানের রাত্রিতে পুনরায় সুপারিশ করেছেন, তাতে কবুল হয়েছে আরেক তৃতীয়াংশ, অতঃপর ১৫ই শা'বানের রাত্রির সুপারিশে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ কবুলিয়াত— প্রাপ্ত হয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। তবে যে সকল বান্দা উদ্ভ্রান্ত উটের ন্যায় অব্যাহা হয়ে দূরে পলায়ন করে, তাদের জন্য কবুল হয় নাই।

এ রাত্রিকে 'মাগফিরাতের রাত্রি'ও বলা হয়। ইমাম আহমদ (রহঃ) রেওয়াজ্যাত করেছেন, হযরত আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : "আল্লাহ তা'আলা অর্ধশাবানের রাত্রিতে বান্দাদের প্রতি বিশেষ করুণাদৃষ্টি করেন এবং দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীত সকলের মাগফিরাত করে দেন : এক, মুশরিক আর দ্বিতীয় হিংসুক।"

এ রাত্রিকে 'পরিত্রাণ ও মুক্তির রাত্রি'ও বলা হয়। ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন : একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে আমাকে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর ঘরে পাঠালেন। আমি তাঁকে (হযরত আয়েশাকে) বললাম, আপনি শীঘ্র করুন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে এসেছি তিনি অর্ধশাবানের রাত্রি সম্পর্কিত জরুরী বিষয়বলী বর্ণনা করছেন। হযরত আয়েশা বললেন, হে আনাস! বস, আমি তোমাকে অর্ধশাবানের রাত্রি সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনাই। একদা সেই রাত্রি ছিল রাসুলুল্লাহর কাছে আমার হিসসা। তিনি আমার সাথে শয্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাত্রিতে এক সময় সজাগ হয়ে আমি তাঁকে বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম। মনে মনে ভাবলাম—তাহলে কি তিনি কিব্তী বাদীর পার্শ্বে চলে গেলেন! বের হয়ে হঠাৎ আমার পা গিয়ে পড়লো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তখন লক্ষ্য করে শুনি—তিনি একাগ্র মনে বলছেন :

سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخِيَالِي وَأَمَّنْ بِكَ قُودَارِي وَهَذِي يَدِي  
وَمَا حَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمًا بِرَجِي لِكُلِّ عَظِيمٍ اِغْفِرِ  
الذَّنْبَ الْعَظِيمَ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ  
سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ.

“আয় আল্লাহ! সর্বান্তঃকরণে—আমার দেহ আমার মুখমণ্ডল সবকিছু আপনার জন্য সেজদাবনত। আমার অন্তঃকরণ আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। এই যে আমার হাত—সেও আপনার প্রতি বিশ্বাসী। এ হাত ও অন্যায়

আর যা কিছু দিয়ে আমি কোন অপরাধ করি—আমাকে মাফ করুন ; হে মহান, মহা অপরাধের ক্ষমার জন্যেও যার অনুগ্রহের আশা করা হয়—আমার বড় বড় গুনাহ—ও মাফ করে দিন। আমার মুখমণ্ডলকে, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দিয়েছেন, কর্ণ ও শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তি যিনি দান করেছেন—আমাকে ক্ষমা করুন।”

অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং এই দো'আ পড়লেন :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ قَلْبًا نَّقِيًّا نَّقِيًّا مِّنَ الشِّرْكِ بَرِيًّا لَا كَافِرًا  
وَلَا شَقِيًّا.

“আয় আল্লাহ! আপনার ভয়ে শিরক থেকে পবিত্র, গুনাহ থেকে স্বচ্ছ অন্তর আমাকে দান করুন—যার মধ্যে কুফরের লেশমাত্র না থাকে, যে অন্তর কোনদিন বঞ্চিত ও দূর্ভাগ্য না-হয়।”

অতঃপর তিনি পুনরায় সেজদায় গেলেন। এ সময় তাঁকে আমি এই দো'আ পড়তে শুনেছি :

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ  
وَبِكَ مِنْكَ لَا اَحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ  
نَفْسِكَ اَقُوْلُ كَمَا قَالَ اَبْنِيْ دَاوُدَ اَعْفِرْ وَجْهِيْ فِي التَّرَابِ  
لِسَيِّدِيْ وَحَقَّ لَوْجْهِ سَيِّدِيْ اَنْ يَغْفِرَ

“আয় আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে আপনার রোষ ও অসন্তুষ্টি হতে পানাহ চাই। আপনার ক্ষমার দোহাই দিয়ে আপনার আযাব ও গজব হতে পানাহ চাই। আপনার দোহাই দিয়ে আপনি থেকে পানাহ চাই। আপনার প্রশংসা করে শেষ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। আপনি তেমনি যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন। আমি তা-ই বলি যা আমার ভাই দাউদ বলেছিলেন—আমি আমার প্রভুর জন্য আমার চেহারা মাটিতে

স্থাপন করি—এতে আমি তাঁর ক্ষমা অবশ্যই পেতে পারি।”

অতঃপর তিনি মাথা উত্তোলন করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন—আপনি কী করছেন আর আমি কি ভাবছি! হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে হুমায়রা (হযরত আয়েশার অপর নাম)! তুমি কি জান না— আজকের এই রাত্রি অর্ধশাবানের রাত্রি, এ রাত্রিতে আল্লাহ তা’আলা বনী কাল্ব গোত্রের অসংখ্য ছাগলের পশমের পরিমাণ লোককে দোযখ থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি দান করেন, তবে ছয় শ্রেণীর লোক ব্যতীত : ১। মদ্যপায়ী ২। পিতা-মাতার অবাধ্য ৩। ব্যভিচারী ৪। সম্পর্ক ছিন্নকারী ৫। ফেতনাবাজ ৬। চুগলখোর। এক বর্ণনায় ফেতনাবাজের স্থলে প্রাণীর ছবি অংকনকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্ধশাবানের এ রাত্রিকে ‘কিসমত ও তকদীরের রাত্রি’ বা ‘বরাতের রাত্রি’ও বলা হয়। হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক শাবান থেকে পরবর্তী শাবান পর্যন্ত যারা মারা যাবে, তাদের নামের লিখিত সূচী এই অর্ধশাবানের রাত্রিতে মউতের ফেরেশতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। অথচ এই মুহুর্তে তাদের কেউ কেউ ক্ষেতে—খামারে কাজ করতে থাকে, কেউ কেউ বিবাহ করতে থাকে, কেউ কেউ অট্টালিকা তৈরীতে মগ্ন থাকে, এদিকে মালাকুল মউত অপেক্ষায় থাকে যে, আল্লাহর হুকুম হবে আর তৎক্ষণাৎ তার জান কবজ করে নিবে।”

অধ্যায় : ১০২

## রমযান মাসের ফযীলত

আল্লাহ তা’আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ  
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেক্রপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর।” (বাকারাহ্ : ১৮৩)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের যুগেও রোযার প্রচলন ছিল ; কিন্তু তাদের রোযা হতো ইশার সময় থেকে নিয়ে পরদিন রাত্র পর্যন্ত। ইসলামের শুরুভাগেও এই নিয়মের প্রচলন ছিল।

আলেমগণের এক জামাতের অভিমত অনুযায়ী নাসারাদের উপরও রোযা ফরয ছিল এবং স্বাভাবিক গতিতে রোযার সময় হতো কখনও গ্রীষ্মকালে কখনও শীতকালে। এতে তাদের সফরে, ব্যবসা-বাণিজ্যে নানারকম ব্যাঘাত দেখা দিতো। তাই, সকলের অভিমত নিয়ে তাদের কর্তা লোকেরা নীত-গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বসন্তকালীন সময়টিকে রোযার জন্য নির্ধারিত করে নেয়, আর নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তনের এই জঘন্য পাপটি মোচনের জন্য অতিরিক্ত দশটি রোযার সংযোজন করে নেয়।

পরবর্তী সময়ে আরও ঘটনা ঘটেছে— তদানীন্তন কালে এক বাদশাহ আপন রোগমুক্তির জন্য মাম্নত করেছিল, সুস্থ হলে আরও সাতটি রোযা বাড়িয়ে নিবে। পরবর্তী বাদশাহ এসে আরও তিনটি রোযা সংযোজন করে মোট পঞ্চাশটি করে নেয়। এরপর এক সময় প্লেগ-মহামারী দেখা দিলে তারা আরও দশটি রোযা বাড়িয়ে নিয়ে ষাট সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।

বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী কোন এক জাতির উপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বিস্মৃত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, সহীহ্‌ অভিমত অনুযায়ী 'রমযান' একটি মাসের নাম, শব্দটি رَمَضَانَ (রামযা'না) থেকে উদ্ভূত, অর্থ— উত্তপ্ত পাথর। আরববাসীরা তীব্র গরমের মৌসুমে রোযা রাখতো। সে সময় তারা বছরের মাসগুলোর নাম রাখে, তখন স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় এ মাসটির অবস্থান ছিল গরম মৌসুমে। তাই, এর নামকরণ হয় 'রমযান'। অন্য এক অভিমত অনুযায়ী উক্ত নামকরণের তাৎপর্য হলো— রোযা মানুষের পাপসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়। এ থেকেই রোযার মাসের নামকরণ হয় রমযান।

রমযানের রোযা ফরয হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। আমলের দিক থেকে এ রোযা যেমন অত্যাবশ্যকীয়, আকীদাগত দিক থেকেও মাহে রমযানের রোযার ফরযিয়তের প্রতি ঈমান রাখা অপরিহার্য। সুতরাং এ ফরযিয়তের অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাকের।

প্রচুর হাদীসে রমযানের রোযার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَاتِ  
لَهُمْ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ -

“যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্র উপস্থিত হয় সব জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং পূর্ণ মাসব্যাপী একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা একজন ঘোষককে হুকুম প্রদান করেন, সে এই মর্মে ঘোষণা দেয়— হে পুণ্যের আশাবাদী! অগ্রসর হও, হে অমঙ্গলকারী! পিছে হট। আরও ঘোষণা দেয়— আছে কোন ক্ষমপ্রার্থী, তাকে ক্ষমা করা হবে। আছে কোন প্রার্থনাকারী, তার প্রার্থনা কবুল করা হবে। আছে কোন তওবাকারী, তার তওবা কবুল করা হবে। সকাল পর্যন্ত এই আহ্বান অব্যাহত থাকে। ইফতারের সময় প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা দশ লক্ষ পাপাচারী ব্যক্তিকে মুক্তি দান করেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিল।”

হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের শেষ তারিখে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন— “তোমাদের উপর এমন একটি মহান মাস ছায়া করছে, যার মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল-কদর। এই লাইলাতুল-কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা এ মাসে তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন এবং রাত্রি জাগরণ করে (তারাবীহর) নামায পড়াকে পুণ্যের কাজ হিসাবে প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে একটি ফরয আদায়ের তুল্য সওয়াব পাবে। আর যে এ মাসে একটি ফরয ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায়ের সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে।

এ মাস সবরের মাস। সবরের বিনিময় জান্নাত। এ মাস সহমর্মিতার মাস। এ মাসে মুমিন লোকদের রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমান সওয়াব লাভ করবে, অথচ রোযাদার ব্যক্তির সওয়াবে বিন্দুমাত্রও ঘাটতি হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে অনেকেরই সামর্থ্য নাই যে, সে অপরকে ইফতার করাবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটু দুধ বা এক টোকা পানি বা একটি খেজুর দ্বারা ইফতার করাবে, তাকেও আল্লাহ তা'আলা সেই সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে ভুগু করে ইফতার করাবে, তার ওনাহ্‌ মাফ হবে, পরওয়ারদিগার আমার হাউজ থেকে তাকে এমন শরবত পান করাবেন যে, এরপর সে কোনদিন পিপাসার্ত হবে না এবং সেই রোযাদারের সমান সওয়াবও সে হাসিল করবে ; অথচ তার সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।

এ মাসের প্রথম অংশ রহমতের দ্বিতীয় অংশ মাগফেরাতের এবং তৃতীয় অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

যে ব্যক্তি এ মাসে আপন গোলাম ও ময়দুরের (দায়িত্বের) বোঝা হালকা করে দিবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিবেন।

তোমরা রমযান মাসে চারটি আমল অধিক পরিমাণে কর ; দুটি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আর দুটি যা না হলে তোমাদের উপায়ান্তর নাই।

প্রথম দুটি হলো : (এক,—) কালেমা তাইয়্যিবাহ্ এবং (দুই,—) এস্তেগফার বেনী বেনী করে পড়। আর দুটি হলো : (তিন,—) আল্লাহর কাছে বেহেশত চাও এবং (চার,—) দোযখ থেকে পানাহ মাগো।”

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

“যে ব্যক্তি খাঁটি মনে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্বের এবং পরের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।”

আরও বর্ণিত হয়েছে—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَنَا أَجْرِي بِهِ

“বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য ; রোযা ব্যতীত। কেননা, তা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান।”

কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়! রোযার ইবাদতকে আল্লাহ্ তা’আলা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তিনি নিজেই এর প্রতিদান।

হাদীস শরীফে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “রমযান মাসে পাঁচটি বিষয় আমার উম্মতকে এমন দেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই। এক—রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মুশকের সুগন্ধি হতেও বেনী সুগন্ধযুক্ত। দুই—ফেরেশতাগণ তার জন্য ইফতার পর্যন্ত গুনাহ্ মাফীর দো’আ করতে থাকে। তিন—দুর্ভৃৎ শয়তানদেরকে এ মাসে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। চার—প্রতিদিন আল্লাহ্ তা’আলা জাম্নাতকে সুসজ্জিত করেন এবং বলেন : আমার নেক বান্দার দুনিয়ার দুঃখ-ক্লেশ ছেড়ে শীঘ্রই (বেহেশতে) আসছে। পাঁচ—রমযানের শেষ রাতে রোযাদারের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ ক্ষমা কি শবে কদরে হয়ে থাকে! আল্লাহর রাসূল বললেন : না, বরং নিয়ম হলো, মজদুর কাজ শেষ করার পরই মুজুরী পেয়ে থাকে।

অধ্যায় : ১০৩

## শবে কদরের ফযীলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বনী ইসরাঈল গোত্রের এক বুয়ূগের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল— “তিনি একাধারে এক হাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে আশ্চর্যবিশিত হলেন এবং স্বীয় উম্মতের জন্যেও সেরূপ নেকীর আশা পোষণ করে আল্লাহ্ তা’আলার নিকট দো’আ করলেন : “হে আল্লাহ! আমার উম্মতের লোকদের আয়ু খুব কম এবং তাদের আমলও অতি অল্প ; আপনি মেহেরবানী করে তাদের নেকী বাড়িয়ে দিন।” অতঃপর আল্লাহ্ তা’আলা দয়া করে এই উম্মতকে লাইলাতুল-কদর দান করলেন। এই মহান রাত্রির ইবাদত বনী ইসরাঈল গোত্রের এক ব্যক্তির একাধারে হাজার মাস জিহাদ করা অপেক্ষা উত্তম। কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতকে উক্ত সুযোগ বিশেষভাবে দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে অন্য কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই।

কথিত আছে, সেই ব্যক্তির নাম ছিল শামুউন। একাধারে এক হাজার মাস তিনি ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং তার ঘোড়ার পশমও শুষ্ক হয় নাই। খোদা-প্রদত্ত ক্ষমতা ও অসম সাহসিকতায় তিনি দূশমনদের উপর হামলা চালাতেন। অতীষ্ঠ হয়ে দূশমনরা তাঁর স্ত্রীর নিকট গোপনে লোক পাঠায় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে মজবুত রশি দিয়ে বেঁধে তাদের সোপর্দ করতে পারলে স্ত্রীকে একটি বড় স্বর্ণের পাত্র পরিপূর্ণ করে স্বর্ণ প্রদান করবে বলে চুক্তি করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর হাত-পা বেঁধে দিল। কিন্তু তিনি জাগ্রত হয়ে হাত-পা নাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই বাঁধন ছুটিয়ে ফেলেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী অজুহাত করে বললে, “আমি আপনার শক্তি পরীক্ষা করেছি মাত্র।” এ সংবাদ কানফেরদের

নিকট পৌছার পর তারা লোহার জিঞ্জীর পাঠিয়ে দিল। পূর্বের ন্যায় এবারও তিনি লোহার জিঞ্জীর খুলে ফেললেন। এবার স্বয়ং ইবলীস কাফেরদের নিকট উপস্থিত হয়ে পরামর্শ দিল, তোমরা স্ত্রীলোকটিকে বল, সরাসরি সেই ব্যুর্গ লোকটিকে যেন সে জিজ্ঞাসা করে— এমন কি জিনিস আছে যা সেই লোক কাটতে না পারে। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : “আমার চুলের গুচ্ছ কর্তন করতে আমি অক্ষম।” তার আটটি দীর্ঘ চুলের গুচ্ছ ছিল, পথ চলার সময় তা যমীন স্পর্শ করতো। লোকটি ঘৃমানোর পর স্ত্রী তার দুই পা ও দুই হাত চার চার গুচ্ছ দ্বারা বেঁধে দিল। অতঃপর কাফেররা এসে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে ছিল এক বিরাট জবাইখানা ; চার শত গজ উচ্চ, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থও অনুরূপ। মাঝখানে এক বিরাট স্তম্ভ। লোকেরা তাঁর কান ও ঠোঁট কেটে দিল। তখনও সমস্ত কাফের লোকজন তাঁর সম্মুখে বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তিনি মুনাজাত করলেন : “ইয়া আল্লাহ্! এই বান্দন ভেঙ্গে দেওয়ার শক্তি আমাকে দান কর, এই স্তম্ভ স্থানচ্যুত করার ক্ষমতা দাও এবং এই অট্টালিকার নীচে চাপা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।” আল্লাহ্ তা’আলা তার দো’আ কবুল করলেন— খোদা-প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে তিনি আপন বান্দন ছুটিয়ে স্তম্ভটিকে স্থানচ্যুত করে ফেললেন। ফলে, ছাদসহ বিরাট অট্টালিকা তাদের উপর পড়ে যায়, আর সমস্ত কাফের ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনি আল্লাহ্র অসীম রহমতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই জিহাদে লোকটির কি পরিমাণ সওয়াব হয়েছে, আমরা কি তা জানতে পারি? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “আমারও তা অজানা।” অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা’আলার নিকট প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা’আলা এই প্রার্থনার জওয়াবে ‘লাইলাতুল-কদর’ দান করলেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “যখন লাইলাতুল-কদর উপস্থিত হয়, তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতাগণের বিরাট দল নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং বসা বা দাঁড়ানো (যে কোন) অবস্থায় আল্লাহ্র বিকরে মগ্ন বাম্পদেরকে তারা সালাম দেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের

জন্য দো’আ করেন।”

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন, কদরের রাত্রিতে কঙ্করের চেয়েও অধিক সংখ্যক ফেরেশতা নাযিল হোন এবং তাদের অবতরণের জন্য সেই রাত্রিতে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। যেমন বর্ণিত আছে— সেই রাত্রিতে নূরের প্রাচুর্য থাকে, বিরাট তজল্লী প্রকাশ পায়, উর্ধ্বজগতের নানা মহিমার বিকাশ ঘটে। পৃথিবীতে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে অনেকের সম্মুখে তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কেউ কেউ যমীন ও আসমানের ফেরেশতাগণকে স্পষ্ট দেখতে পান, আকাশমণ্ডলীর অন্তরায় তাদের সম্মুখ থেকে উঠে যায়। ফেরেশতাগণকে তাদের বাস্তব আকৃতিতে অবলোকন করেন, তাঁদের অনেকেই দাঁড়ানো অনেকেই বসা অনেকেই রুকূতে অনেকেই সেজদায় অনেকেই যিকর-আযকারে মগ্ন অনেকেই আল্লাহ্র শোকারে মগ্ন অনেকেই তসবীহ পড়া অবস্থায় আবার অনেকেই কালেমা তাইয্যোবাহ পাঠরত অবস্থায় তাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হোন।

এমনিভাবে অনেক ইবাদতগুণার বান্দার সম্মুখে বেহেশত পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে— সেখানকার উন্নত মহলসমূহ, বাসগৃহাদি, হুঁর, নহর, বৃক্ষ, ফল, আরশ, আরশের ছাদ, আশ্বিয়া, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের মান-মর্যাদা ও আউলিয়া কেরামের পুরস্কার তাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়। মোটকথা, তারা রীতিমত সেই উর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করতে থাকেন। তাদের সম্মুখে দোযখ, তারা রীতিমত সেই উর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করতে থাকেন। তাদের সম্মুখে দোযখ, দোযখের ভয়াবহ আযাব, দোযখের গর্তসমূহ ও কাফেরদের অবস্থা দৃষ্ট হয়। আবার অনেকের সম্মুখে আল্লাহ্ তা’আলার অনন্ত রূপ সরাসরি পরিস্ফুটিত হয়—তারা কেবল এই অসীম সত্তার দীদারেই মগ্ন হয়ে থাকেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “রমযানের সাতাইশতম রাত্রির সকাল পর্যন্ত পূর্ণ ইবাদত আমার নিকট পূর্ণ রমযান মাসের অন্যান্য সকল রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়।” হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যে সকল মহিলা পূর্ণ রাত্রি জাগরণে অক্ষম তারা কি করবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তাকিয়া বা বালিশে কোনরূপ ঠেস না লাগিয়ে কিছু সময় আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকবে— তা আমার নিকট সমগ্র উম্মতের পুরা রমযান ইবাদত করা অপেক্ষা প্রিয়।”

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “যে ব্যক্তি কদরের রাত্রি জাগরণ করল এবং তাতে দুই রাক‘আত নামায আদায় করল এবং আল্লাহর কাছে গুনামাফীর জন্য দো‘আ করল, আল্লাহ তা‘আলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং সে যেন আল্লাহর রহমতের দরিয়াকে ডুব দিল। এইরূপ ব্যক্তি জিবরাঈল (আঃ)–এর ডানার স্পর্শ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তির এই স্পর্শ লাভ হবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

~~~~~

অধ্যায় : ১০৪

## ঈদের মাসায়েল

হিজরী শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল-ফিতরের এবং যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ ঈদুল-আযহার দিন। রমযান মাসের রোযার ইবাদত সমাপনান্তে মুসলমানগণ ঈদুল-ফিতরের মাধ্যমে আনন্দ উদ্‌যাপন করে। উভয় ঈদেই তারা বিশেষভাবে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করে থাকে। ঈদুল-ফিতরের পর ছয়টি রোযা রাখা হয়। হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ঈদের দিনগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা প্রচুর নৈ‘আমত বর্ষণ করেন। এ জন্যেই মুসলমানগণ এ দিনগুলোর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে ; এতে পরম আনন্দ উপভোগ করে। হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ঈদুল-ফিতরের নামায হিজরী দ্বিতীয় সনে আদায় করেছেন এবং পরবর্তীতে কখনও এই নামায পরিত্যাগ করেন নাই। তাই ঈদের নামায (অতি জরুরী) সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ (ওয়াজিব)।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—“তোমরা তাকবীর (আল্লাহ আকবার)–বলার মাধ্যমে তোমাদের ঈদগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।” হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “যে ব্যক্তি ঈদের দিন তিনশত বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** পাঠ করে এর সওয়াব সকল মৃত মুসলমানের ক্রাহের মাগফেরাতের জন্য বঞ্চে দিবে, এ তসবীহের বরকতে প্রত্যেকের কবরে এক হাজার নূর দাখেল হবে এবং মৃত্যুর পর এই তাসবীহ পাঠকারী ব্যক্তির কবরেও আল্লাহ তা‘আলা এক হাজার নূর দান করবেন।”

হযরত ওহূব ইবনে মুনাঝেহ্ থেকে বর্ণিত, ঈদের দিনগুলোতে ইবলীস চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এ অবস্থা দেখে অন্যান্য শয়তান তার আশে-পাশে উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে : হে আমাদের সর্দার! আপনার

রোব ও অসন্তুষ্টির কারণ কি? তখন ইবলীস জওয়াবে বলে : আজকের (ঈদের) এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন—এখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির সাধ-অভিলাষে উন্মত্ত রেখে আখেরাতের বিষয়ে গাফেল ও অন্যমনস্ক করে দাও।

হযরত ওহ্ব থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈদুল-ফিতরের দিনে বেহেশত সৃষ্টি করেছেন এবং এ দিনেই বেহেশতে ভূবা (আনন্দ)—বৃক্ষ রোপণ করেছেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এই দিনেই সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং এ দিনেই ফেরআউনের যাদুগরদের তওবা কবুল হয়েছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيدِ مُحْتَسِبًا نُرِيْمَتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

“যে ব্যক্তি ঈদুল-ফিতরের রাতে ঈমান ও ইখলাসের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করবে, তার দেল্ সেদিন যিন্দা থাকবে যেদিন অনেকের দেল্ মরে যাবে।”

হযরত উমর (রাযিঃ) ঈদের দিন তাঁর পুত্রের পরিধানে জীর্ণ পোষাক দেখে কৈদ ফেল্লেন। পুত্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বৎস! অন্যান্য কিশোর-বালকরা ঈদের দিনে তোমাকে এ পোষাক পরিহিত দেখবে, আমার ভয় হয়—এতে তোমার দেল্ ভাঙ্গতে পারে। হযরত উমরের পুত্র জওয়াবে বললেন, আব্বাজান! দেল্ ঐ ব্যক্তিরই ভাঙতে পারে, যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারে নাই কিংবা যে সন্তান তার মা-বাপের সন্তোষ লাভ করতে পারে নাই ; আমি তো আশা করি, আপনার সন্তুষ্টি আমার প্রতি রয়েছে এবং এ ওসীলায় আল্লাহ্ পাকও আমার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত উমর আরও কঁদলেন, বুদ্ধিমান সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব দো'আ দিলেন।

জনৈক আরবী কবি চমৎকার বলেছেন : “লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা

করে, কাল ঈদের দিন তুমি কী পোষাক পরিধান করবে? বলি, যে পোষাক পরিধান করলে কয়েক ঢোক পান করা যায়—দারিদ্র্য ও ছবর এ দুই পোষাকের মাঝখানে এমন একটি দেল্ অবস্থান করছে, যে দেল্টি প্রতি ঈদ ও জুম'াতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করে থাকে :

الْعَيْدُ فِي مَاتَمٍ اِنْ غَبَّتْ يَا اَمَلِي  
وَالْعَيْدُ اِنْ كُنْتُ فِي مَرَايٍ وَوَسْتَمِعَا

“হে প্রেমাম্পদ! তুমি ব্যতীত আমার ঈদ আনন্দ নয় বরং তা শোক-বিলাপ। প্রকৃত ঈদ আমার হবে যদি হে মাহুব! তোমার দর্শন লাভ করতে পারি এবং তোমাকে কিছু শোনাত পারি।”

বর্ণিত আছে— ঈদুল-ফিতরের দিন ভোর-সকালে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেন ; তাঁরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং গলিপথের মুখে দাঁড়িয়ে সজোরে আওয়ায করে ঘোষণা দিতে থাকেন— মানব ও জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য সকল মাখলুকাত যা শুনে পায়— ওহে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা তোমাদের দয়াময় রব্বের প্রতি ঝুকো, অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি তোমাদেরকে দান করবেন, বড় বড় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। লোকেরা যখন নামাযের স্থানে পৌঁছে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : ঐ মজদুরের কী বিনিময় হতে পারে যে তার কাজ সম্পন্ন করেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, তার বিনিময় হচ্ছে, পূর্ণ প্রাপ্য তাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, বিনিময়ে আমি তাদেরকে আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করলাম।



## অধ্যায় : ১০৫

### যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব ও ফযীলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “ইবাদত-বন্দেগীর জন্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট প্রিয়তর দিন আর নাই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনগুলোতে ইবাদত করা কি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তবে যদি কেউ আপন জান-মাল নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সবকিছুই আল্লাহর রাস্তায় বিসর্জন দেয়।”

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “ইবাদতের জন্য আল্লাহ তা’আলার নিকট এ দশ দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন আর নাই। আরজ করা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কি এর সমতুল্য নয়? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, না ; তবে সক্রিয় জিহাদের তীব্রতায় যদি কারও ঘোড়া আহত হয়ে যায় এবং খোদ মুজাহিদ যদি ধূলি-মলিন হয়ে যায়।”

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক যুবকের অভ্যাস ছিল যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দিতেও সে রোযা রাখতে আরম্ভ করে দিতো, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে গেলে যুবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনগুলোতে তোমার রোযা রাখার কারণ কি? সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউন— এ দিনগুলো পবিত্র হজ্জের প্রতীক ও হজ্জ আদায়ের মুবারক সময়— হজ্জ আদায়কারীগণের সাথে আমিও নেক আমলে শরীক হই, এই আশায় যে, তাদের সাথে আমার দো’আও আল্লাহ তা’আলা কবুল করে নিবেন। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন :

“তোমার এক একটি রোযার বিনিময়ে একশত গোলাম আযাদ করার, একশত উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার এবং জিহাদের সাজ-সামানে ভরপুর এক ঘোড়া জিহাদের জন্যে দেওয়ার সওয়াব রয়েছে, তন্মধ্যে ৮ই যিলহজ্জ (ইয়াওমত-তারবিয়া)—এর রোযার বিনিময়ে এক হাজার গোলাম আযাদ করার এক হাজার উট দান করার এবং সাজ-সামান সহ জিহাদের জন্য এক হাজার ঘোড়া দান করার সমতুল্য সওয়াব রয়েছে, আবার ৯ই যিলহজ্জ (ইয়াওমুল-আরাফা)—এর রোযার বিনিময়ে দুই হাজার গোলাম আযাদ করার, দুই হাজার উট দান করার জিহাদের সাজ-সামান সহ দুই হাজার ঘোড়া দান করার সওয়াব রয়েছে।”

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

يَعْدِلُ صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ وَيَعْدِلُ صَوْمُ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ سَنَةٍ

“আরাফার দিনের (৯ই যিলহজ্জ) রোযা দুই বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য আর ‘আশূরা’ (১০ই মুহররম)—এর রোযা এক বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য।”

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتَّمَمْنَاهَا بِعِشْرِ

“এবং আমি মুসা (আঃ)—এর সাথে ওয়াদা করেছি ত্রিশ রাত্রির এবং তা পূর্ণ করেছি আরও দশ দ্বারা।” (আ’রাফ : ১৪১)

মুফাস্সিরগণ বলেছেন, সেই ‘দশ’ ছিল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— আল্লাহ তা’আলা দিনসমূহের মধ্য হতে চারটি, মাসসমূহের মধ্য হতে চারটি, নারীদের মধ্যে চারজন, সর্বপ্রথম যারা জামাতে প্রবেশ লাভ করবে তাদের মধ্যে হতে চারজন এবং স্বয়ং জামাত যে সকল নেকবান্দাদের প্রত্যাশী তাদের মধ্যে হতে ২৪

চারজনকে নির্বাচন করেছেন এবং বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

(১) জুম'আর দিন : জুম'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তা দান করবেন—সেই প্রার্থিত বস্তু দুনিয়ার হোক বা আখেরাতের হোক।

(২) আরাফার দিন : (যে দিনটিতে পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়) আরাফার দিন যখন উপস্থিত হয়, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে ফখর করে বলেন—হে ফেরেশতারা! তোমরা দেখ—আমার বান্দারা উপস্থিত হয়েছে; ধুলি-মলিন অবস্থায় তাদের কেশ অগুছালো, আমার জন্যে তারা ধন-মাল খরচ করেছে শারীরিকভাবে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়েছে; তোমরা সাক্ষী থাক—আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

(৩) ঈদুল-আযহা অর্থাৎ কুরবানীর দিন : ঈদুল-আযহার দিনে বান্দার কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

(৪) ঈদুল-ফিতরের দিন : রমযান মাসের রোযা রাখার পর ঈদুল-ফিতরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে লোকজন যখন বের হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে সম্ভাবন করে বলেন : প্রত্যেক শ্রমিক শ্রমদানের পর পারিশ্রমিক চেয়ে থাকে, আমার বান্দারা পূর্ণ মাস রোযা রেখেছে, আজকে ঈদের দিন তারা বের হয়েছে আমার কাছে পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায়। হে ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাক—আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। এক আওয়াক্কারী আওয়াজ দিয়ে থাকে, 'হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কর যে, তোমাদের গুনাহসমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।'

যে চারটি মাসকে নির্বাচন করা হয়েছে, তা হচ্ছে, (১) রজব (২) যিলকদ (৩) যিলহজ্জ (৪) মুহররম।

বিশেষ মর্যাদাবান যে চারজন মহিলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন, (১) হযরত মারযাম বিনতে ইমরান (২) হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, জগতের সকল মহিলার মধ্যে সর্বপ্রথম ইনিই আল্লাহ ও রাসূলর

প্রতি ঈমান এনেছেন। (৩) হযরত আছিয়া বিনতে মুযাহিম, তিনি ছিলেন ফেরআউনের স্ত্রী। (৪) হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি জান্নাতবাসীন্ী মহিলাদের সর্দার রাযিয়াল্লাহু আনহা।

যারা সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে—এক একজন সম্প্রদায় হতে এক একজন—সেই চারজন হচ্ছেন, (১) আরবদের মধ্য হতে সাইয়িদুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (২) পারস্যদের মধ্য হতে হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) (৩) রোমীয়দের মধ্য হতে হযরত সুহাইব রোমী (রাযিঃ) (৪) হাবশাবাসীদের মধ্য হতে হযরত বেলাল (রাযিঃ)

জান্নাত যাদের জন্য উদ্ভূত, তাদের মধ্য হতে এ চারজনকে নির্বাচন করা হয়েছে : (১) হযরত আলী (রাযিঃ) (২) হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) (৩) হযরত আশ্মার ইবনে ইয়্যাসির (রাযিঃ) (৪) হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিঃ)।

ছুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : ৯ই যিলহজ্জ যে ব্যক্তি রোযা রাখলো, আল্লাহ তাকে হযরত আইয়ুব (আঃ)—এর কঠিন রোগ-পরীক্ষায় ছবর করার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আরাফার দিনে (৯ই যিলহজ্জ) রোযা রাখলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে হযরত ঈসা (আঃ)—এর সওয়াবের ন্যায় সওয়াব দান করবেন।

ছুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, যখন আরাফার দিন উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত বিস্তৃত করে দেন। এই দিনে যে পরিমাণ লোকদেরকে দোষখ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, অন্য কোনদিন তা হয় না। যে ব্যক্তি আরাফার এই দিনে রোযা রাখলো, তার গত বৎসর ও আগামী বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ছগীরা গুনাহ; কবীরা গুনাহ মাফীর জন্য তওবা করতে হবে) আরাফার দিনের রোযার ওসীলায় গত ও আগামী এ দুই বছরের গুনাহ মাফ হওয়ার তাৎপর্য হলো, এ দিনটি দুই ঈদের মাঝখানে পড়েছে, মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দের এ দুটি দিন। এতে তাদের জন্যে গুনাহ-মাফীর

চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? আর আশুরার দিনের (১০ই মুহররম) আগমন ঘটে, দুই ঈদ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর। তাই এ দিনে রোযার ওসীলায় গুনাহ্ মাফ হয় এক বৎসরের। আরেকটি কারণ হচ্ছে, আশুরার দিনটি হচ্ছে হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্য আর আরাফার দিনটি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। তাঁর বুয়ুগী সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেরামের উপর। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধ্যায় : ১০৬

## আশুরা' দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত

[ আশুরা বলতে মুহররম মাসের দশ তারিখকে বুঝায় ]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায়ে পৌঁছার পর দেখতে পেলেন যে, ইহুদীরা আশুরার দিনটি রোযা রাখে। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললো, এ দিনটিতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলকে ফেরআউনের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেছিলেন। তাই শুকরিয়া ও সন্মানার্থে এ দিনটিতে আমরা রোযা রাখি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমরা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের অধিক নিকটবর্তী।” অতঃপর তিনি উম্মতকে এ দিনে রোযা রাখতে হুকুম করলেন।

আশুরার দিনের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কিত বহু রেওয়াযাত বর্ণিত রয়েছে। এই দিনে হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল হয়, এই দিনেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিনেই তাঁকে জাহ্নাতে দাখেল করা হয়। আরশ, কুরসী, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জাহ্নাত এই দিনেই সৃষ্টি করা হয়। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন, আগুন থেকে এই দিনেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর উম্মত ফেরআউনের যুলুম-অত্যাচার থেকে চিরমুক্ত হন এবং ফেরআউন ও তার অনুচরবর্গ সমুদ্রে ডুবে ধ্বংস হয়। এ দিনেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্মলাভ করেন, এই দিনেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ দিনেই হযরত ইব্রীস (আঃ)-কে উচু স্থানে (আসমানে) উঠানো হয়। এ দিনেই হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ জুদী পাহাড়ে এসে স্থির হয়, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ দিনেই হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহী দেওয়া হয়। এ দিনেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) চোখের জ্যোতি ফিরে পান। এ দিনেই

হযরত আইয়ুব (আঃ) জটিল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন। এ দিনেই সর্বপ্রথম আসমান থেকে যমীনে বৃষ্টিপাত হয়।

দশই মুহররম অর্থাৎ আশুরার দিনের রোযা পূর্বের উষ্মতগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ ছিল। এমনকি বর্ণিত আছে যে, রমযানের পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল, অতঃপর রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযার ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায় এবং তা নফলে পরিণত হয়।

রাসুল্লাহ সালাম্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বেও এ রোযা রেখেছেন। মদীনা শরীফে তশরীফ আনয়ন করার পর তিনি এ রোযার বিষয় আরও গুরুত্ব ও জোর তাকীদ দেন এবং বলেছেন আগামী বৎসর আমি বেঁচে থাকলে মুহররমের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখবো। কিন্তু তিনি এ বৎসরই আল্লাহ তাআলার পেয়ারা হয়ে গেছেন, ফলে ১০ই মুহররম ছাড়া অন্য তারিখে রোযা রাখা সম্ভব হয়ে উঠে নাই। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত করেছেন।

৯ ও ১০ই মুহররম সম্পর্কে হযরত আকরাম সালাম্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তোমরা দশই মুহররমের পূর্বের দিন এবং পরের দিন রোযা রাখ এবং এভাবে তোমরা ইহুদীদের বিপরীত কর। কেননা ইহুদীরা কেবল ১০ই মুহররমেরই রোযা রাখে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) শেখ আবুল-ঈমান কিতাবে রেওয়াযাত করেছেন, আশুরার দিন যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনদের জন্য মুক্ত মনে প্রশস্ত হস্তে ব্যয় করবে, আল্লাহ তাআলা সারা বছর তার আয়-রোযগারে বরকত দিবেন।

আশুরার দিন সুরমা ব্যবহার করলে সে বৎসর সুরমা ব্যবহারকারী কোনরূপ চক্ষুরোগে আক্রান্ত হবে না এবং এ দিন গোসল করলে তার কোনরূপ অসুস্থতা দেখা দিবে না—এ হাদীসটি মওজু ও মনগড়া, হাকেম (রহঃ) পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই দিনে সুরমা ব্যবহার করা বিদআত। ইবনে কাইয়িম (রহঃ) বলেন, সুরমা ব্যবহার করা, দানা (বীজ) ভাজা, তৈল ব্যবহার করা, খোশবু ব্যবহার করা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মিথ্যাচারী লোকদের মনগড়া ও বানোয়াট কথাবার্তা মাত্র।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আশুরার দিন হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর উপর যা ঘটেছে, বস্তুতঃ তা ছিল হযরত হুসাইনের শাহাদাত ; যার ফলে আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে, আহলে বাইতগণের মধ্যে অধিকতর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর মূসীবতকে স্মরণকারী ব্যক্তি শুধু ‘ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজেউন’ পড়বে। এতে হযরত আকরাম সালাম্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার অনুসরণ হবে এবং সেই সওয়াব নসীব হবে, যার ওয়াদা আল্লাহ পাক এ আয়াতে করেছেন :

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ০

“তাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ তাদের রব্বের তরফ হতে, এবং সাধারণ করুণাও। আর তাঁরাই এমন লোক, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।” (বাকারাহঃ ১৫৭)

অতঃপর শিয়ারা যেসব অসঙ্গত ও বাজে বিষয়াদির প্রচলন ঘটিয়ে রেখেছে—যেমন মৃত ব্যক্তির গুণ-কীর্তন করে বিলাপ করা, শোক পালন করা ইত্যাদি। এসব বিষয় থেকে পুরাপুরিভাবে বেঁচে থাকবে। কেননা এসবে লিপ্ত হওয়া কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয়। বস্তুতঃ এহেন কার্যকলাপ যদি আদৌ কল্যাণকর হতো, তাহলে হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর মাতামহ হযরত মুহাম্মদ সালাম্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত উপলক্ষে প্রতি বছর এসব কার্য পালন করা জরুরী হতো, কেননা তিনিই ছিলেন এর জন্যে বেশী হকদার।

অধ্যায় : ১০৭

## মেহমানদারী বা অতিথি পরায়ণতা

হযুর আকরাম সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “মেহমান-অতিথির প্রতি মন সংকীর্ণ করে তাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ কর না। কেননা, যে মেহমানকে ঘৃণা করলো, সে আব্লাহ্কে ঘৃণা করলো, আর যে আব্লাহ্কে ঘৃণা করলো, আব্লাহ্ তাকে ঘৃণা করেন।”

হযুর আকরাম সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন : “যার মধ্যে অতিথি-পরায়ণতা নাই তার মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই।”

আঁ-হযরত সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বিস্তশালী লোকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোথাও গমন করছিলেন। লোকটির প্রচুর সম্পদ ও গরু-ছাগলের পাল ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ্ সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমানী সে করে নাই। পরবর্তীতে জনৈক স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন ; স্ত্রীলোকটি স্বপ্ন পরিমাণ ছাগলের মালিক ছিল। ছাগল যবেহ করে সে হযুর সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমানী করলো। তখন তিনি বললেন : “তোমরা এই দু' জনের আচরণে তারতম্য লক্ষ্য করেছ কি? বস্তুতঃ এ আখলাক ও উদার চরিত্র আব্লাহ্ তা'আলার খাছ দান; তিনি যাকে পছন্দ করেন, তাকেই এ নেয়ামত দান করেন।”

হযুর আকরাম সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত হযরত আবু রাফে' (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মেহমানের আগমন হয়। তখন তাঁর ঘরে কিছু ছিল না। তিনি বললেন : অমুক ইহুদীর নিকট গিয়ে বল, আমার মেহমান এসেছে ; রজব মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য সে যেন আমাকে কিছু আটা ধার দেয়। ইহুদী বললো : আমার কাছে অন্য কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি আটা ধার দিবো না। আমি হযুরকে এ কথা জানালে পর তিনি

বললেন : আব্লাহ্‌র কসম, আমি আসমানেও বিস্ত্র যমীনেও বিস্ত্র ; সে যদি (বিনা বন্ধকে) আমাকে ধার দিত, আমি অবশ্যই তা পরিশোধ করতাম। যাও, আমার যুদ্ধের এ বর্মটি নিয়ে তাঁর কাছে বন্ধক রেখে আটা ধার নিয়ে আস।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি আহার করতে ইচ্ছা করতেন, নিজের সঙ্গে আহারে শরীক করার জন্য মেহমানের তালাশে কখনও এক মাইল দুই মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যেতেন। তাঁকে লোকেরা উপাধি দিয়েছিল ‘আযু-যাহাফান’ অর্থাৎ অতুলনীয় অতিথি-পরায়ণ। এটা তাঁর বিশুদ্ধতম নিয়ত ও অপরিসীম এখলাসেরই কল্যাণ যে, আজও পর্যন্ত তাঁর আবাসভূমি মক্কা মুকাররমায় সেই অনুপম অতিথি-পরায়ণতা অব্যাহত রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট প্রতি রাতে তিন থেকে দশ পর্যন্ত কখনও একশত পর্যন্ত অতিথি-মেহমানের সমাগম থাকতো। একটি রাতও মেহমান থেকে খালি যেতো না।

একদা হযুর আকরাম সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে : ঈমান কি? তিনি বলেছেন : খানা খাওয়ানো এবং অধিক পরিমাণে সালামের প্রসার ঘটানো।

নবী করীম সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহ্-মাফী এবং আব্লাহ্‌র কাছে মর্তবা বুলন্দ হওয়ার জন্য এ পন্থা বলেছেন যে, “তোমরা লোকদেরকে খানা খাওয়াও, রাত জেগে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড় যখন অন্যান্য লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে।”

নবী করীম সাব্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কহুল হজ্জ কৌন্টি? তিনি বলেছেন : “যে হজ্জ লোকদেরকে খানা খাওয়ানো এবং হাস্যমুখে লোকদের সাথে কথা বলা রয়েছে।”

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন : “যে ঘরে মেহমানের আগমন নাই, সে ঘরে ফেরেশতা আসে না।”

মোটকথা, খানার দাওয়াত ও আপ্যায়নের অনুকূল অসংখ্য রেওয়াজ্যাত রয়েছে।

জনৈক আরবী কবি বলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে : “মেহমানের প্রতি আমার ভালবাসা কেন হবে না, তার আগমনে আমি কেন আনন্দিত ও

উল্লসিত হবো না? অথচ মেহমান আমার গৃহে উপস্থিত হয়ে সে নিজের রিযিকই আহার করে; অধিকন্তু সে আমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে।”

পরিপূর্ণ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মনীষীদের উক্তি হচ্ছে—কারও প্রতিদান বা অনুগ্রহ তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন তা হঠাৎ হাসিমুখে ও মিষ্ট ভাষার মাধ্যমে হয়।”

জনৈক কবির বক্তব্য হচ্ছে, সওয়াযী থেকে অবতরণের পূর্বেই আমি আমার অতিথির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলি; তাকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করে তুলি অথচ আমার ঘরে তখন থাকে দুর্ভিক্ষ।”

দাওয়াত-দাতা মেজ্বানের উচিত, যে যেন নেক ও পরহেয্গার লোকদেরকেই আহ্বান করে। হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

“পরহেয্গার লোকের খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্যও পরহেয্গার লোক ছাড়া খেতে দিও না।” বিশেষভাবে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আপ্যায়নকারী মেজ্বানের জন্য এভাবে দো'আ করেছেন :

اَكَلْ طَعَامَكَ الْاَبْرَارُ

“নেক ও সৎ লোকেরা তোমার খাদ্য আহার করুন।”

হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ

“সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওলীমা, ভোজ হচ্ছে যাতে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয়, দরিদ্রদের করা হয় না।”

সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দাওয়াত হচ্ছে, যাতে আত্মীয়-পরিজনকেও দাওয়াত করা হয়। কেননা, এতে একদিকে যেমন আত্মীয়তার হক আদায় হয়, অপরদিকে তাদের সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া থেকেও হেফাজত হয়। এমনিভাবে বন্ধুজন

ও পরিচিতজনদের মধ্যে তরতীব ও ক্রমিকতার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। কেননা, (একই মজলিসে বা অনুষ্ঠানে) কিছু লোকের বিশেষ আপ্যায়নে অবশিষ্টদের মনে কষ্ট প্রদান হয়।

এমনিভাবে মেজ্বানের আরও উচিত, গর্ব প্রকাশ ও সুনামের জন্য যেন আপ্যায়ন করা না হয়; বরং নিয়ত হওয়া চাই—জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা ও অনুকরণ এবং মুসলমান ভাইদের আনন্দ দান ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের লালন ও বৃদ্ধিকরণ। এমনি ভাবে যদি কারও পক্ষে দাওয়াত গ্রহণ করা মুশকিল হয়, তাকে যবরদস্তি করে বাধ্য করাও উচিত নয়। আর যে ব্যক্তির উপস্থিতি অন্যান্যদের জন্য অসহনীয় বা কোন কষ্টের কারণ হয়, তাদেরকেও একত্রে দাওয়াত করা উচিত নয়। কেবল এমন লোককেই দাওয়াত করা চাই যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে তা কবুল করে।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন : যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত করে, যে তা গ্রহণ করা অপছন্দ করে, তবে এর জন্য দাওয়াতকারী ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে। এতদসঙ্গে যদি সে দাওয়াত কবুল করে নেয়, তবে দাওয়াতকারীর দুটি গুনাহ্ হবে। কেননা, অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাকে বাধ্য করা হলো। আল্লাহ-ভীতিপরায়ণ লোকদের আপ্যায়ণ করা মূলতঃ ইবাদতে তাদের শক্তি-যোগান ও সহযোগিতা করা, পক্ষান্তরে, অবাধ্য লোকদের খাওয়ানোর অর্থ হলো, না-ফরমানী ও পাপকার্যে তাদের সাহায্য করা।

জনৈক দর্জি ব্যক্তি হযরত ইবনে মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেঃ আমি রাজা-বাদশাহদের পোশাক তৈরী করে দিই, এতে আমিও কি তাদের জুলুম-অত্যাচারের গুনাহের ভাগী হবো? তিনি বললেন : কি বলছ? জালামের গুনাহের ভাগী তো সে, যে তোমার কাছে সুই, সূতা ইত্যাদি সেলাই-কাজের উপাদান বিক্রি করে, আর তুমি নিজেই জালাম। দাওয়াত কবুল করা সুনতে মুআক্কাদাহ। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তা ওয়াজিবও হয়।

হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “হাগলের একটি পায়ী ধরাও যদি আমাকে আপ্যায়ন করা হয়, কিংবা আমাকে যদি হাগলের একটি হাতের অংশও হাদিয়া দেওয়া হয়, আমি তা কবুল করবো।”

অধ্যায় : ১০৮

## জানাযা, কবর ও কবরস্থান

জেনে রাখ—জানাযা প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের জন্য বড় একটা শিক্ষণীয় বিষয়, আর যারা ধীন ও আখেরাতের চিন্তা-চেতনার বিষয়ে গাফেল ও উদাসীন, তাদেরকে মৃত ব্যক্তির এই জানাযা মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী সকল অবস্থা ও আখেরাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু আফসুস, আজকাল অন্তরসমূহ এতো কঠিন হয়ে গেছে যে, অসংখ্য জানাযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সতর্ক হওয়া তো দূরের কথা, বরং মনের কাঠিন্য উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তারা চিরকাল কেবল অন্যদেরই জানাযা দেখতে থাকবে, কিন্তু নিজেরদেরও যে শীঘ্রই জানাযার খাটলিতে শুতে হবে, এ ধ্যান-খোয়াল কারও হয় না। অথচ প্রকৃত বাস্তব সত্য যা কাউকে ক্ষমা করবে না তা হচ্ছে, এক সময় অবশ্যই এমন এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে, যখন তাদের এহেন সকল গর্ব-গুমান ভণ্ডুল প্রতীয়মান হবে। কেননা আজকে যাদের জানাযা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, একদিন তারাও ঠিক এমনি ধরণের দণ্ড-অহমে লিপ্ত ছিল, কিন্তু কই—আজকে তাদের এ অবস্থা কেন? সুতরাং প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য যে, যখনই কোন জানাযা দেখবে, তখন মনে করবে যে, এটি আমারই জানাযা ; কেননা, ঠিক একরূপই আমার জানাযাও তৈরী হতে দেবী নাই, আজ না হোক কাল, না হয় পরশু আমার মৃতদেহও এভাবে খাটলিতে করে বহন করে কবরস্থানে নিয়ে দাফন করা হবে।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) যখনই কোন জানাযা দেখতেন, তখনই বলতেন : “চল, আমিও পিছনে পিছনে আসছি।”

হযরত মাকহুল দিমাক্বী (রাযঃ) জানাযা দেখেই বলতেন : “চল, আমিও আসছি ; হায়! কত বড় শিক্ষা, কিন্তু এরই পাশাপাশি দ্রুত গাফলত ও উদাসীনতাই আমাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে ; আগের জন চলে গেল অথচ পরবর্তী জনের কোনই চেতনা নাই।”

হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাযিঃ) বলেন : “যখনই আমি কোন জানাযায় শরীক হয়েছি, আমার মনে একই প্রশ্ন বারবার জাগতে থাকে যে, কি হলো, এ মৃতের সাথে আরো কিরূপ ব্যবহার করা হবে?”

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রাযঃ)—এর ভাইয়ের ইনতেকাল হলে তার জানাযার পিছনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বের হলেন এবং বলতে থাকলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমার চক্ষু জুড়াবে না যে পর্যন্ত জানতে না পারবো যে, তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ, আর যতক্ষণ আমি যিন্দা ততক্ষণ তা জানতে পারবো না।”

হযরত আমাশ (রাযঃ) বলেন : “আমরা জানাযার পিছনে পিছনে যেতাম—তখন সকলেই দুঃখ-ভারাক্রান্ত থাকতাম ; কেউ বুঝতে পারতাম না যে, কে কাকে সাহুবা দিবে।”

হযরত ছাবেত বুনাঈ (রাযঃ) বলেন : আমরা জানাযার পিছনে যেতাম—তখন প্রত্যেকেই বশত-খণ্ডে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকতো।”

এ ছিল তাদের অবস্থা ; তাদের অন্তরে মৃত্যুর ভয়, আখেরাতের চিন্তা। কিন্তু আফসুস! আমাদের অবস্থা এই যে, জানাযার পিছনে পিছনে আমরা যাই ; আর অধিকাংশই আমরা হাসতে থাকি, বেহুলা কথা বলতে থাকি, মৃতের তাজা সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলাপ-আলাচনায় মগ্ন থাকি, আত্মীয়-স্বজনেরা কে কিভাবে কোন্ প্রক্রিয়ায় তার সম্পত্তি পেতে পারে—এসব বিষয় চিন্তা-ধান্দায় মগ্ন হয়ে যায়। অনতি পরেই যে নিজের জানাযাও ঠিক একরূপে আসছে, সে বিষয়ে কেউ চিন্তা করে না—তবে যাকে আল্লাহ্‌ পাক তওফীক দেন সে ব্যতিক্রমভূক্ত। বস্তুতঃ এহেন গাফলত ও উদাসীনতার কারণ হচ্ছে অধিক পাপাচার ও অবাধ্যতা। যার ফলে অন্তরসমূহ প্রস্তরসম কঠিন হয়ে গেছে ; অহেতুক কার্যকলাপে জীবনপাত হচ্ছে। আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে এহেন ধ্বংসাত্মক গাফলত থেকে হেফাজত করুন।

জানাযার পিছনে অনুসরণের সময় উত্তম হলো, অনুষ্ঠ আওয়াজে মনের গভীরতায় কাঁদতে থাকা। মানুষ যদি আপন জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতো, তবে এই করুণ মুহুর্তে সে মৃতের জন্যে না কেঁদে নিজের উপরেই কাঁদতো—হায় জানিনা আমার কি দশা হয়!

হযরত ইব্রাহীম যাইয়্যাত (রহঃ) একদা লক্ষ্য করলেন, কিছু লোক জনৈক মৃতের উপর কাঁদাকাটি করছে। তিনি বললেন : ওহে ! তোমরা তার উপর কাঁদছো? না ; বরং নিজেরদের উপর কাঁদো, সে তো তার ভয়ানক তিনটি ঘাঁটি পার হয়ে গেছে ; মালাকুল-মওত তথা মৃত্যুর ফেরেশতার চেহারা দর্শন, মৃত্যুর যন্ত্রণা, আর পরিণাম ফলের ভয়।

হযরত আবু আমর ইবনে আলা (রহঃ) বলেন : “আমি হযরত জরীর (রহঃ)—এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি কাউকে কবিতার এক-দুটি পংক্তি লিখাছিলেন ; এমন সময় তাঁর সম্মুখ দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; তৎক্ষণাৎ তিনি থেমে গেলেন আর বললেন : আল্লাহর কসম, এসব জানাযা আমাকে পূর্বাচ্ছেই বৃদ্ধ করে দিয়েছে, অতঃপর নিম্নের এ পংক্তিগুলো পাঠ করলেন :

تَرَوُنَا الْجَنَائِزَ مُقْبِلَاتٍ  
وَلَهُنَّ حِينَ تَذْهَبُ مَذِيرَاتٍ

“জানাযার খাটলি সম্মুখপানে ধাবমান হয়ে আসে, আর আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা যখন দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, আমরা গাফেল-উদাসীন হয়ে যাই।”

كِرْوَعَةٍ ثَلَاثَةٍ يَمْنَارِ ذَنْبٍ  
فَلَمَّا غَابَتْ عَادَتْ رَايَعَاتٍ

“বায়ের হংকার ও আক্রমণের ভয়ে লোকেরা আতংকিত হয়, কিন্তু তা কেটে গেলে পর সেই পূর্ববৎ গাফলত ও নিশ্চিন্ত অবস্থা।”

জানাযায় উপস্থিত ও শরীক হওয়ার সময় উচিত হলো— গভীর ধ্যান ও চিন্তা করবে, বিনয় ও অবনত মস্তকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করবে যেরূপ ফেকাহ-গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। মৃতব্যক্তি ভাল-মন্দ যেরূপ লোকই হোক না কেন তুমি তার সর্বাবস্থায় সুধারণা পোষণ করবে, নিজের ব্যাপারে কুধারণা রাখবে এবং সর্বদা আশংকা বোধ করবে ; যদিও বাহ্যতঃ তোমার

অবস্থা ভাল বোধ হয়। কারণ, জানা নাই তোমার শেষ পরিণতি কি হবে— প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত কিছু বলতে পারে না।

হযরত উমর ইবনে যর (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার জনৈক প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করে। কর্মজীবনে সে অসং লোক ছিল বিধায় কিছু লোক তার জানাযা থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু ইবনে যর (রহঃ) তার জানাযায় শরীক হন। যখন তাকে কবরে রাখা হয়, তখন তিনি কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন : “ওহে অমূকের পিতা ! আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন— তুমি আল্লাহর তওহীদ ও একত্ব বিশ্বাসী ছিলে, সেজদায় মুখমণ্ডল ধূলায়িত করেছো ; যদিও লোকেরা বলে, তুমি পাপী ; কিন্তু পাপী আমাদের মধ্যে কে নয়। (বস্তৃতঃ কেউ নিজের পরিব্রাজ্যের বিষয় নিশ্চিন্ত হতে পারে না।)

কথিত আছে, বসরার কোন এক অঞ্চলে জনৈক দুষ্ট ও উগ্রংখল প্রকৃতির লোক মারা যায়। তার জানাযা উঠানোর জন্য একজন লোকও সাহায্যকারী পাওয়া যায় নাই। কেননা, তার দুচ্চরিত্রের কারণে কেউ কোনদিন তার খোঁজ-খবর রাখে নাই ; এখন মৃত্যুর পর তার জানাযা উঠানোর বিষয়েও কারও কোন সদিচ্ছা বা আগ্রহ নাই। একমাত্র তার স্ত্রীই ছিল ব্যবস্থাপক। স্ত্রী দুজন শ্রমিকের মাধ্যমে জানাযা ময়দানে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখানে কেউ তার নামাযে উপস্থিত হলো না। অবশেষে স্ত্রী তাকে দাফন করার জন্য বিজন মরুভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে অদূরেই একটি পাহাড়ের উপর ছিলেন একজন ইবাদত-গুয়ার আল্লাহর ওলী-বুয়ুর্গ। তিনি দেখলেন, জানাযা প্রস্তুত। নামাযের উদ্দেশ্যে তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসলেন। তৎক্ষণাৎ গোটা শহর খবর হুড়িয়ে পড়লো যে, অমুক বুয়ুর্গ অমুক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য শহরবাসীরা এসে উপস্থিত হয়ে গেল। তিনি সকলকে নিয়ে সেই লোকের জানাযা পড়লেন। লোকেরা অবাক বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে গেছে যে, একজন ফাসেক ও দুরাচারী লোকের জানাযা তিনি পড়লেন ! তাদের এ বিস্ময়ের জবাবে বুয়ুর্গ বলেছেন : “আমাকে স্বপ্নযোগে বলা হয়েছে যে, তুমি অমুক স্থানে যাও ; সেখানে একটি জানাযা দেখবে, মৃতব্যক্তির স্ত্রী ছাড়া তার সাথে আর কেউ থাকবে না। তুমি সে লোকটির জানাযার নামায পড়ে



দাও, কেননা আল্লাহর দরবারে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।” লোকেরা এ কথা শুনে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। অতঃপর সেই বুয়ুর্গ স্ত্রীলোকটিকে উপস্থিত করে তার স্বামীর আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বললো : আমার স্বামী নামকরা মদ্যপায়ী লোক ছিল, প্রায় সময়েই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকতো। বুয়ুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার জানা মতে তার কোন নেক আমল ছিল কি? সে বললো : তিনটি বিষয় তাঁর মধ্যে ছিল : এক, প্রতিদিন সকালে নেশা-অবস্থা থেকে হুঁশ এসেই কাপড়-চোপড় বদলিয়ে উঠ করে জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করতো। দুই, তার ঘরে সর্বদা এক-দুইজন এতীম অবশ্যই থাকতো, যাদেরকে সে নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাসতো; যখনই তারা এদিক-সেদিক চলে যেতো সে অস্থির হয়ে তাদেরকে তালash করে বের করতো। তিন, রাতের অন্ধকারে মাঝে-মাঝে মদমত্ততা থেকে নিবৃত্ত হয়ে সে কাদতো আর বলতো : “আয় আল্লাহ! আমার মত এই জঘন্য পাপী ও দুরাচারীকে দিয়ে তুমি জাহান্নামের কোন কোণটুকু ভরবে?” এই প্রশ্নান্তরে সকলের কাছেই বিষয়টুকু খুলে গেল এবং সেই বুয়ুর্গও সেখান থেকে চলে গেলেন।

হযরত যাহ্বক (রহঃ) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বাপেক্ষা দুনিয়াত্যাগী কে? তিনি বলেছেন : “যে ব্যক্তি কবর এবং কবরস্থিত আযাবের কথা কখনও বিস্মৃত হয় না, পার্থিব সাধ-অভিলাষ সম্পূর্ণ বর্জন করে চলে, চিরস্থায়ী জীবনকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, আগত পরবর্তী মুহূর্তটিরও কোন আশা-ভরসা করে না এবং নিজকে সর্বদা কবরবাসীদের একজন বলে গণ্য করে।”

হযরত আলী (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কি ব্যাপার—আপনি কবরবাসীদের প্রতিবেশী হয়ে গেছেন; কেবল সেখানেই পড়ে থাকেন? তিনি বললেন : আমি তাদেরকে অতি উত্তম ও সং প্রতিবেশী রূপে পেয়েছি—তারা সম্পূর্ণ নির্বাক; অথচ আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

হযরত উসমান (রাযিঃ) কোন কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেই কাদতো আর স্তম্ভ করতেন, এমনকি তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—জান্নাত ও জাহান্নামের কত আলোচনাই তো আপনি করেন, কিন্তু

তখনও আপনাকে এক্রপ কাদতে দেখা যায় না; অথচ কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়েই আপনি অনবরত কাদতে থাকেন? তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কবরই হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল, যদি এই প্রথম মঞ্জিলে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে তার মুক্তি না হয়, তবে পরবর্তী সবগুলো মঞ্জিল তার জন্য আরও কঠিনতর হবে।”

বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) একদা একটি কবরস্থান দেখে সওয়্যরী থেকে নেমে গেলেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো— ইতিপূর্বে এক্রপ করতে আপনাকে আর কখনও দেখি নাই; এর কারণ কি? তিনি বললেন : “কবরবাসীদের আমি দেখলাম, তাদের এবং আল্লাহর মাঝখানে কোন অন্তরায় নাই, কাজেই দুই রাকআত নামাযের মাধ্যমে আমিও আল্লাহর নৈকট্য লাভ ব্রতী হলাম।”

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : “সর্বপ্রথম আদম-সন্তানের সাথে তার গর্ত (কবর) কথা বলে। সে বলে— আমি (বিষাক্ত) সাপ-বিছুর ঘর, আমি নির্জন একাকীত্বের ঘর, আমি অপরিচিত-অনো ঘর, আমি যোর অন্ধকার ঘর; আমি তোমার জন্য এগুলোই প্রস্তুত রেখেছি, বল— তুমি কি প্রস্তুত করে এনেছো?

হযরত আবু যর গেফারী (রাযিঃ) বলেন : “আমি কি তোমাদেরকে আমার সর্বাপেক্ষা অসহায়ত্ব ও মোহতাজীর দিনটি বলবো? সে দিনটি হচ্ছে, যে দিন আমাকে কবরে রাখা হবে।”

অধ্যায় : ১০৯

## দোযখ-আযাবের ভয়

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'আখানি বেশী বেশী করতেন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।” (বাকারাহ : ২০১)

মুসনাদে আবু ইয়াল্লা কিভাবে বর্ণিত হয়েছে, একদা হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যে বলেছেন : ওহে লোক সকল! তোমরা বিরাট দুটি বিষয় অর্থাৎ জামাত ও জাহান্নামের কথা কখনও ভুলো না। এ কথা বলে তিনি এতো কাঁদলেন যে, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের উভয় পাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অতঃপর আরও বললেন : কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি জানতে আমি যা জানি, তবে আবাদি ছেড়ে তোমরা বিজন এলাকায় ছুটে পালাতে এবং ভয়ে-আতংকে দিশাহারা হয়ে আপন আপন মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করতে।

দ্ববরানী আওসাতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এমন এক সময় উপস্থিত হলেন, যখন তিনি ইতিপূর্বে কখনও উপস্থিত হন নাই। হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রত অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে জিবরাঈল! আপনার কি হয়েছে, আপনাকে এরাপ বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন? তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা দোযখের

অগ্নি উত্তপ্ত করার হুকুম দিয়েছেন, তারপরেই আমি আপনার নিকট এসে হাজির হলাম। নবীজী বললেন : দোযখের কিছু বিবরণ আপনি আমাকে শুনান। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন : আল্লাহ তা'আলা দোযখকে উত্তপ্ত হওয়ার হুকুম করলে সে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলে, দোযখের অগ্নি শুভ্র বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আবার হুকুম করলেন। এবারও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। ফলে সে লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় দোযখকে আরও উত্তপ্ত হওয়ার হুকুম করেন। অতএব দোযখের অগ্নি আরও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। পরিশেষে এ আগুন অন্ধকার কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সেই আগুনের অবস্থা এই যে, এর স্ফুলিঙ্গের কোন শেষ নাই এবং এর লেলিহানেরও কোন অবধি নাই। ইয়া রাসুল্লাহ! আমি ঐ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন— সুইয়ের ফুটো পরিমাণ অংশও যদি দোযখের ছিদ্র হয়ে যায়, তবে জগতের সমস্ত মানুষ ভয়ে আতংকে মরে যাবে। এ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের প্রহরীদের একজনও যদি দুনিয়াবাসীর সম্মুখে প্রকাশ পায়, তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী এর ভয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের শিকলসমূহের এমন একটিও যদি দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতের উপর রাখা হয় যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে, তবে পাহাড়সমূহ বিগলিত হয়ে যাবে আর শিকলটি যমীনের সর্বশেষ সীমানায় গিয়ে থেমে যাবে। নবীজী বললেন : হে জিবরাঈল! ক্ষান্ত হও, আর বলা না ; মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তর ফেটে যাবে ; আর আমি এখনই মৃত্যুবরণ করবো। এ কথা বলে নবীজী হযরত জিবরাঈলের প্রতি তাকিয়ে দেখলেন— তিনি কাঁদছেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) আরজ করলেন, আমি কেন কাঁদবো না, আমার তো আরও বেশী পরিমাণে কাঁদা উচিত। কেননা, আল্লাহর কাছে যদি আমার বর্তমান অবস্থার স্থল অন্য কোন অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আমার কি উপায় হবে, তা আমি জানি না। আমি জানি না— ইবলীসের উপর যেভাবে বিপদ এসেছে, সেরূপ আমার উপরও এসে

পতিত না হয়, অথচ সেও ফেরেশতা ছিল। জানি না— হারুত ও মারুতের উপর যেভাবে আপদ এসেছে, আমার উপরও সেরূপ এসে না পড়ে। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঁাদতে লাগলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-ও কঁাদতে লাগলেন, এভাবে উভয়ই কঁাদতে থাকলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো— হে জিবরাঈল! হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাদের উভয়কে তাঁর নাকরমানী ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) উর্ধ্বজগতে চলে গেলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, কয়েকজন আনসারী সাহাবী ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবীজী বললেন : তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন রয়েছ, অথচ তোমাদের মাথার উপর রয়েছে জাহান্নাম, আমি যা জেনেছি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুবই কম হাসতে এবং অধিক মাত্রায় জ্ঞপন করতে, খাওয়া-দাওয়া তোমাদের কাছে ভাল লাগতো না এবং নির্জন ও উজাড় জঙ্গলে আল্লাহর তালোশে তোমরা বের হয়ে যেতে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো— হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করা না, তোমাকে সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে পাঠিয়েছি, হতাশ করার জন্য নয়।

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : “তোমরা সকলে মধ্য ও সঠিক পথের পথিক হয়ে যাও এবং হক ও সত্য থেকে দূরে সরে যেও না।”

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন : হে জিবরাঈল! আমি হযরত মিকাদিলকে কখনও হাসতে দেখি নাই ; এর কারণ কি? তিনি বললেনঃ যখন থেকে দোযখ বানানো হয়েছে, তখন থেকেই হযরত মীকাদিলের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।”

ইবনে মাজাহ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়াত করেন যে, তোমাদের দুনিয়ার এ আগুনের তাপ দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। পরন্তু এটাকে যদি আরও দু'বার পানি দিয়ে ধৌত করা না হতো, তবে সেটা তোমাদের ব্যবহারযোগ্য হতো না। তদুপরি এ আগুন আল্লাহর কাছে দো'আ করে,

যেন পুনরায় এর মধ্যে আর উতাপ না আসে।”

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَنَانِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

“যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে, তৎক্ষণাৎ আমি তাদের পূর্ব-চর্মের স্থলে অন্য চর্ম সৃষ্টি করে দিবো, যেন তারা আযাবই ভোগতে থাকে।” (নিসা : ৫৬) অতঃপর তিনি হযরত কা'ব (রাযিঃ)-কে বললেনঃ আপনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। যদি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে আমি তা সমর্থন করবো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করবো। হযরত কা'ব (রাযিঃ) ব্যাখ্যা করলেন যে, আদম-সন্তানের চর্ম প্রতিদিন ছয় হাজার বার স্থালানো হবে এবং প্রতিবারই নতুন চর্ম সৃষ্টি করে নেওয়া হবে। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন : আপনি সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন ; আমি সমর্থন করি।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উক্ত আয়াতের তফসীলে বলেন : “দোযখের আগুন তাদেরকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার খেয়ে ভস্মীভূত করবে ; প্রতিবার বলা হবে— পূর্বনরূপ হয়ে যাও। বার বার এমনি হবে এবং এভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

দুনিয়ার সর্বাধিক সুখী-স্বচ্ছন্দ পাপাচারী দোযখী একজন মুসলমানকে এনে জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনা হবে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, হে আদমের সন্তান! জীবনে কখনও সুখ-স্বচ্ছন্দ দেখেছিলে? সে বলবে, আল্লাহর কসম, কখনও দেখি নাই। অতঃপর দুনিয়াতে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্টপ্রাপ্ত একজন বেহেশতীকে এনে তাকেও জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনা হবে। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে : জীবনে কখনও কোন কষ্ট দেখেছো? সে বলবে, আল্লাহর কসম, কখনও দেখি নাই।

ইবনে মাজাহ (রহঃ) রেওয়াত করেন : দোযখীদের মধ্যে জন্দনরোল সৃষ্টি হবে। কঁাদতে কঁাদতে তাদের অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে চক্ষুযুগল হতে রক্ত ঝরতে থাকবে। এতে তাদের চেহারার ভিতর গর্তের মত হয়ে যাবে, যাতে নৌকা চালাতে চাইলে তা-ও সম্ভব হবে।

হযরত আবু ইয়া'লা (রহঃ) বর্ণনা করেন : হে লোক সকল! তোমরা কাঁদ, কাঁদতে না পারো তো কাঁদার ভাব-আকৃতি ধারণ কর। কেননা, দোযখীরা আগুনের ভিতর কাঁদতে থাকবে ; অশ্রুজল তাদের গওদেশে প্রবাহিত হবে যেমন নদীর পানি প্রবাহিত হয়। অবশেষে তাদের অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে যাবে অতঃপর তারা রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করবে এবং তাদের চোখে (বড় বড়) খাদ পড়ে যাবে।

অধ্যায় : ১১০

## মীযান-পাল্লা ও পুলসিরাত

আবু দাউদ শরীফে হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন : আয়েশা! তুমি কাঁদছো কেন? হযরত আয়েশা বললেন : আমার দোষখের কথা মনে পড়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেদিন আপনি আপনার স্ত্রী-পরিজনের কথা কি স্মরণ করবেন? হযরত বললেন : সেদিন তিন জায়গায় তো কারুরই কারো কথা স্মরণ থাকবে না : ১. যখন মীযান-পাল্লা স্থাপন করতঃ আমলের পরিমাপ করা হবে, মানুষ ভীতি-বিহ্বল থাকবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হবে নাকি বদীর পাল্লা। ২. আমলনামা বিতরণের সময়, তা ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে। ৩. পুলসিরাত পার হওয়ার সময়, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত ; যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানতে না পারবে যে, পার হতে পারবে কিনা জাহান্নামে কেটে পড়ে যাবে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি— ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য কি আপনি কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন? তিনি বললেন : “ইনশাআল্লাহু করবো।” আমি আরজ করলাম : সেদিন আপনাকে আমি কোথায় তালাশ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাকে পুলসিরাতের নিকট তালাশ করো। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনাকে পুলসিরাতের নিকট না পাই? তিনি বললেন : তাহলে মীযান-পাল্লার নিকট যোগো। আমি আরজ করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি মীযান-পাল্লার নিকটেও না পাই? তিনি বললেন : তাহলে আমাকে হাউজে-কাউসারের নিকট তালাশ করো। আমি এই তিন জায়গার যেকোন একটিতে অবশ্যই থাকবো।

হাকেম (রহঃ) রেওয়ামাত করেন যে, কিয়ামতের দিন মীযান-পাল্লা রাখা হবে। যদি সমগ্র আসমান-যমীনও এতে রাখা হয়, তবে তা রাখা সম্ভব। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেন : ইয়া আল্লাহ্! এতে কার ওজন করা হবে? আল্লাহ্ বলবেন : আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমি যার ইচ্ছা তার ওজন করবো। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন :

سُبْحَانَكَ مَا عِبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

“হে আল্লাহ্! আপনি অনন্ত পবিত্র আপনার হক আদায় করে আমরা কিছুই ইবাদত করতে পারি নাই।”

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন : দোযখের পৃষ্ঠ বরাবর পুলসিরাতকে স্থাপন করা হবে। তলোয়ারের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও ধারালো হবে। পা পিছলিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হবে। পরন্তু অগ্রভাগ বাঁকানো আঁকড়া তথা লোহার শলাকা হবে, যা দিয়ে সে ছৌঁ মেরে আটকিয়ে নিবে। অনেকেই তাতে পড়ে যাবে। আবার অনেকে ভিতরে পড়ে যাওয়ার আতংক সহকারে বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে, অনুকূপ অনেকে ঝঞ্চাবাত্যার গতিতে, অনেকেই অশ্বের গতিতে, অনেকে দৌড়িয়ে, আবার অনেকে হাটার গতিতে পার হয়ে যাবে। অবশেষে একজন আসবে, আগুন যাকে স্পর্শ করেছে এবং দোযখের শাস্তি কিছুটা সে আশ্বাদন করেছে, আল্লাহ্ তা’আলা তাকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর তাকে বলবেন : তুমি আমার কাছে চাও ; আবদার কর। সে বলবে, পরওয়ারদিগার! আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি সারা জাহানের রব! আল্লাহ্ বলবেন : তুমি চাও ; আদার কর (আমি দিবো)। অতঃপর সে বহু আশা-আকাংখা ও আদার পেশ করবে। সব যখন তার শেষ হবে, তখন আল্লাহ্ তা’আলা বলবেন : তুমি যা কিছু চেয়েছ, সে সঙ্গে আরও সেই পরিমাণ তোমাকে দেওয়া হলো।

মুসলিম শরীফে হযরত উম্মে মুবাশশির আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি হযরত হাকসা (রাযিঃ)-কে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সাহাবীগণের যারা বৃক্ষের নীচে ‘বাইয়াতে রিদওয়ানে’ ছিলেন, তাদের কেউ ইনশাআল্লাহ্ দোযখ

যাবেন না। হযরত হাকসা বললেন : তবে কুরআনের এ আয়াত?

وَلَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

“আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে তা অতিক্রম করবেন।”  
(মারয়াম : ৭১)

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পরবর্তী আয়াতেই ইরশাদ হয়েছে :

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ۝

“অতঃপর আমি সেই সকল লোককে নাজাত করে দিবো, যারা আল্লাহ্কে ভয় করতো এবং জালেম লোকদেরকে নতজানু অবস্থায় তাতে ছেড়ে দিবো। (মারইয়াম : ৭২)

‘মুসনাদে আহমদ’ কিতাবে রয়েছে যে, ‘দোযখ অতিক্রম করা’র বিষয়টিতে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন : মুমিনদের জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন : তা সকলেরই অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্কে ভয় করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা’আলা নাজাত করে দিবেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন : “তোমাদের সকলকেই তাতে যেতে হবে” ; এ কথা বলার সময় তিনি আপন কর্ণদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, এ কথা যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্বকর্ণে না শুনে থাকি, তবে যেন আমি বধির হয়ে যাই। তিনি বলেন : আয়াতে উল্লেখিত ‘ওরাদ’ অর্থ প্রবেশ করা ; সুতরাং নেক বান্দা কিংবা না-ফরমান বান্দা সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তবে মুমিনদের জন্য তা আরামদায়ক ও সুশীতল হয়ে যাবে, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য হয়েছিল। এমনকি তাদের এই আরামপ্রদ শীতলতার কারণে জাহান্নাম এই বলে আওয়াজ করবে :

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ۝

“অতঃপর আমি সেই সকল লোককে নাজাত করে দিবো, যারা আল্লাহকে ভয় করতো, আর সীমালংঘনকারীদেরকে নতজানু অবস্থায় তাতে ছেড়ে দিবো।” (মারইয়াম : ৭২)

হাকেম (রহঃ) বলেন : লোকেরা (সুশীতল ও আরামদায়ক অর্থে) দোযখে প্রবেশের পর নিজ নিজ আমলের অনুপাতে অনেকেই বিন্দুতের গতিতে, অনেকেই ঝঞ্চাবাত্যার গতিতে, অনেকেই অশ্বের গতিতে, অনেকেই সওয়ারীর গতিতে, অনেকেই দৌড়ের গতিতে, অনেকেই হাটার গতিতে বের হয়ে আসবে।

অধ্যায় : ১১১

## রাসূলুল্লাহর ওফাত

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত নিকটবর্তী হয়, তখন আমরা উম্মুল-মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ)—এর ঘরে উপস্থিত ছলাম। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টি করলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি বললেন : খোশ আমদেদ ; মোবারকবাদ ! আল্লাহ তোমাদের হায়াত দরায় করুন, তোমাদের আশ্রয় দান করুন, সাহায্য করুন। আমি তোমাদেরকে ওসীয়াত করছি—সর্বদা আল্লাহকে ভয় কর ; তাকওয়া এখতিয়ার কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত ; তোমরা আল্লাহর মোকাবিলায় তাঁরই সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠে এবং তার বান্দাদের উপর কখনও দণ্ড-অহংকার করো না। আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের সুনির্ধারিত সময় অতি নিকটবর্তী—এ প্রত্যাবর্তন সিদরাতুল-মুনতাহা, জাঙ্গাতুল-মাওয়া ও ভরপুর বেহেশতী পেয়ারার দিকে। তোমরা সকলেই আমার সালাম গ্রহণ কর। আরও সালাম তাদের প্রতি, যারা আমার পর ধীন-ইসলামে প্রবেশ করবে।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ)—কে জিজ্ঞাসা করলেন : হে জিবরাঈল ! আমার পর উম্মতের নেগাহবান (রক্ষণাবেক্ষণকারী) কে হবে? এর জবাবে আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈলের নিকট ওহী করলেন : আমার হাবীবকে সুসংবাদ দাও যে, তাঁর উম্মতের ব্যাপারে আমি তাঁকে লজ্জিত করবো না। তাঁকে আরও সুসংবাদ দাও যে, পুনরুত্থানের সময় তিনি সর্বপ্রথম যমীন থেকে বের হবেন ; হাশরের দিন তিনি সমবেত সকলের সর্গার হবেন এবং তাঁর উম্মত জাঙ্গাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্যান্য উম্মতের

জন্য জামাত হারাম থাকবে। নবীজী বললেন : আমি শাস্ত ও নিশ্চিন্ত হলাম।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম করলেন সাত কুঁয়া থেকে সাত মোশক পানি সংগ্রহ করে তা দিয়ে তাঁকে গোসল করাতে। আমরা সে অনুযায়ী তাঁকে গোসল করানোর পর তিনি অনেকটা আরাম অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হলেন। এমনকি নামাযে ইমামতি করলেন, উহুদ জিহাদের শহীদানের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ওসীয়াত করলেন : হে মুহাজ্জেরীন! তোমরা বৃদ্ধি পাবে, আর আনসারগণ যে অবস্থার উপর আছে, তার উপর বৃদ্ধি পাবে না। আনসারগণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আমি তাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। সুতরাং তোমরা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সম্মান কর, তাদের কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হলে তা উপেক্ষা কর।

অতঃপর তিনি বললেন : “আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত ধন-দৌলত ও সুখ-শান্তি দান করতে চাইলেন। কিন্তু সে তা গ্রহণ না করে আল্লাহকেই গ্রহণ করলো।” এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন ; তিনি বুঝে গেলেন যে, নবীজী নিজকেই উদ্দেশ্য করেছেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ)—এর ব্যাকুলতা দেখে নবীজী তাঁকে শাস্ত হতে বললেন, আরও বললেন যে, এই মসজিদের দিকে একমাত্র আবু বকর ছাড়া অন্য কারও দরজা যেন খোলা না রাখা হয়। কেননা, প্রেম ও ভক্তির দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই আবু বকরকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানি।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে, (পালাক্রমে নির্দিষ্ট) আমার দিনে এবং আমার কোলে ইনতেকাল করেন। সেদিন আল্লাহ তা'আলা আমার লু'আব ও তাঁর লু'আব (মুখের লাল) একত্র করেছেন—আমার ভাই আবদুর রহমান এক খণ্ড মেসওয়াক হাতে আমার গৃহে উপস্থিত হোন। হযরত নবীজী এক দৃষ্টিতে মেসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেসওয়াক করতে চাইছেন বুঝতে পেরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— মেসওয়াকটি আপনাকে দিবো? তিনি মন্তকে (সম্মতিসূচক) ইশারা করলেন। আমি তাঁকে মেসওয়াকটি দিলাম।

তিনি মুখে প্রবেশ করিয়ে মেসওয়াকটিকে শক্ত অনুভব করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম— মেসওয়াকটি আমি নরম করে দিবো? তিনি মন্তকে (সম্মতিসূচক) ইশারা করলেন। আমি তা নরম করে দিলাম। নবীজীর সম্মুখে পানির একটি মোশক রাখা ছিল। এর ভিতর তিনি হাত দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বাস্তবিক মৃত্যুর যন্ত্রণা বড় কঠিন। অতঃপর তিনি উপরের দিকে হাত উঠিয়ে উচ্চারণ করলেন :

الرَّفِيقَ الْأَعْلَى

“সেই প্রিয়তম বন্ধুকেই চাই।”

তখন আমার বুঝতে আর বাকী রইলো না যে, নবীজী এখন আর আমাদের মাঝে থাকতে রাজী নন।

হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আপন পিতা থেকে রেওয়াজাত করেন যে, আনসারগণ যখন দেখলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে এসেছে, তখন মসজিদের চতুর্পার্শ্বে তারা ব্যাকুল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। হযরত ফযল ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) নবীজীর নিকট হাজির হয়ে লোকদের এহেন অবস্থা জানান। অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ)—ও নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ জানান। পরিস্থিতি জেনে নবীজী বাইরের দিকে আপন হস্ত মোবারক সম্প্রসারণ করে বললেন, তোমরা আমার হাতখানি ধর। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর হাতখানি ধরে রাখলেন। হযুর জিজ্ঞাসা করলেন : “তোমরা কি বলছো?” তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আপনার ওফাত হয়ে যায় আর শ্রীলোকেরা আপনার নিকট তাদের পুরুষদের জমা হওয়ার জন্য চিৎকার করতে লাগে। অতঃপর হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহস করে হযরত আলী ও হযরত ফযল (রাযিঃ)—এর কাঁধে ভর করে বের হলেন। হযরত আক্বাস (রাযিঃ) নবীজীর আগে আগে ছিলেন। নবীজীর মাথায় তখন পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলে অগ্রসর হয়ে মিস্বরের নীচের সিঁড়িটির উপর বসলেন। লোকজন সকলেই বসলো। হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন : “ওহে লোকসকল! আমি

জানতে পেরেছি, আমার মৃত্যুর ভয়ে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত। এর অর্থ হলো—প্রকরাস্তরে তোমরা এ মৃত্যুকে অস্বীকার করছো। অথচ তোমাদের নবীর মৃত্যু কোন বিস্ময়কর বা অভূতপূর্ব বিষয় নয়। আমি কি তোমাদেরকে কোন মৃত্যুসংবাদ শুনাই নাই, অথবা তোমরাই কি এরূপ সংবাদ শুন নাই? আমার পূর্বের কোন নবী কি চিরকাল যিন্দা রয়েছেন? যার ফলে আমিও যিন্দা থেকে যাবো? শুনে নাও— আমি আমার পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্য চাই, তোমরাও তার সাথে গিয়ে মিলবে। আমি তোমাদেরকে আওয়ালীন তথা প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য ওসীয়াত করছি আর মুহাজিরগণও পরস্পর যেন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এ ওসীয়াত করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالْعَصْرَةَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۚ

“যমানার কসম, নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে, এবং একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে, এবং একে অন্যকে (আমলের) পাবন্দ থাকার উপদেশ দিতে থাকে (তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে)।” (আছর : ১-৩)

জগতের প্রতিটি কাজ ও বিষয় আল্লাহর হুকুমই সংঘটিত হয়। কোন বিষয়ে বিলম্ব হলে জলদি করতে নাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কারো তাড়াহুড়ার কারণে কোন বিষয় সময়ের পূর্বেই সংঘটিত করেন না। পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে (সীমা লংঘন) করবে, সে পরাভূত হবে। আল্লাহকে যে ধোকা দিতে চেষ্টা করবে, সে নিজেই ধোকার মধ্যে পড়বে। আল্লাহ পাক বলেন :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ

“সুতরাং যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাক, তবে কি তোমাদের এই

সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর আত্মীয়তা কর্তন করে ফেলবে?” (মুহাম্মদ : ২২)

আমি তোমাদেরকে আনসারগণের সাথে সদ্ধাবহার ও সুসম্পর্কের ওসীয়াত করছি। তারাই তোমাদের পূর্বে দারুল-ইসলামে (মদীনায়) এবং হীন ও ঈমানের উপর অটল রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি তোমাদের এহসান ও সদ্ব্যবহার হওয়া চাই। তারা কি নিজেদের ফলমূলে তোমাদের অংশ রাখে নাই? তারা কি নিজেদের গৃহে তোমাদের আবাস দেয় নাই? তারা কি নিজেদের জীবনের উপর তোমাদের জীবনকে প্রাধান্য দেয় নাই? অথচ তাদের নিজেদেরও অভাব-অনটন ছিল? খবরদার! দুই ব্যক্তির উপর যদি তোমাদের কেউ আমীর বা শাসক নিযুক্ত হয়, তবে তাঁদের নেক লোকদের উয়র যেন কবুল করে এবং অন্যায়কারীকে মার্জনা করে। খবরদার! তাঁদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিও না। খবরদার! আমি তোমাদের জন্য সত্য ও সঠিক পথের দিশারী। অচিরেই আমার সাথে তোমাদের দেখা হবে। হাউজে-কাউসারের সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রইল। আমার হাউজে-কাউসার শ্যাম দেশের বুসরা থেকে ইয়ামানের সানআ পর্যন্ত দূরত্ব অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। হাউজে-কাউসারের পানি দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র, মাখনের চেয়েও বেশী মোলায়েম, মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট ; তা থেকে একবার যে পান করবে সে পিপাসার্ত হবে না কোনদিন। হাউজের কাঁকরগুলো হচ্ছে মুক্তা ও মোতির দানার, আর নীচের যমীন হচ্ছে মুশকের। হাশরের ময়দানে যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত হবে, সে আর সব রকম কল্যাণ ও সাফল্য থেকেও বঞ্চিত হবে। খবরদার! যে ব্যক্তি সেদিন আমার সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন তার জিহ্বা ও হাতকে সংযত করে।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ) আরজ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কুরাইশদেরকে ওসীয়াত করুন। তিনি বললেন : ‘হীনের ব্যাপারে আমি কুরাইশদেরকে ওসীয়াত করি। লোকেরা কুরাইশদের তাবো বা অনুসারী—সং লোকেরা তাদের সং লোকের আর অসং লোকেরা তাদের অসং লোকের। সুতরাং কুরাইশদের উচিত হলো, মানুষের কল্যাণ ও হিতকামনা করা। হে লোকসকল! গুনাহ মানুষের সুখ-শান্তি ও নেআমতকে নষ্ট করে দেয় এবং সৌভাগ্যকে বদলিয়ে দেয়। সাধারণ লোকেরা যদি সং হয়, তবে



তাদের শাসকও সং হবে, আর যদি তারা অসং হয়, তবে তাদের শাসকও অসং হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَكَذَلِكَ نُؤَيِّنُ بِعَظْمَىٰ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

“আর এভাবেই আমি সংযুক্ত করে দেই জালেমদের কতিপয়কে তাদেরই কতিপয়ের সাথে তাদেরই কার্যকলাপের দরুন।” (আনআম : ১২৯)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন : হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) কে বলেছেন : হে আবু বকর! ভূমি কিছু বল। তখন তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ওফাত কি নিকটবর্তী? তিনি বললেন : হাঁ; নিকটবর্তী আরও নিকটবর্তী। আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত নেআমত-রাজি আপনার জন্য মোবারক হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আরও যদি এমন হতো যে, আমরা আমাদের পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারতাম। হযুর বললেন : সিদরাতুল-মুনতাহার দিকে, তারপর জামাতুল-মা'ওয়া, উচ্চতর জামাতুল-ফেরদাউস, ভরপুর বেহেশতী পেয়ালা, প্রিয়তম বন্ধু ও পরিত্র নাজ-নেয়ামত ও প্রচুর আরাম-আয়েশের দিকে। আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে গোসল কে দিবে? বললেন : আমার আহলে বাইত যারা। আরজ করলেন : আপনাকে কিরাপ বস্ত্রে কাফন দেওয়া হবে? বললেন : আমার পরিহিত এই পোষাকে, ইয়ামনী জোড়ায় এবং মিসরীয় সাদা কাপড়ে। আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জানাযার নামায কে পড়াবে? এ কথা বলে আমরা কৈদে ফেললাম, নবীজীও কাঁদলেন, অতঃপর তিনি বললেন : আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তার নবীর পক্ষ থেকে তোমাদের উত্তম বিনিময় দন করুন ; তোমরা আমার গোসল ও কাফনকার্য সমাধা করার পর এ গৃহেই আমার কবরের পার্শ্বে জানাযার খাটলি রেখে দিও, অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য তোমরা বাইরে চলে যেও। সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ্ রাক্বুল-আলামীন আমার প্রতি দয়া ও রহমতের সালাত ও সালাম পড়বেন :

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

“তিনি ও তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।” (আহযাব : ৪৩)

অতঃপর আমার জানাযার নামাযের জন্য ফেরেশতাগণ অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন। সর্বপ্রথম তাঁদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তারপর হযরত মীকাঈল (আঃ) তারপর হযরত ইসরাফীল (আঃ) তারপর হযরত আবরাঈল (আঃ) প্রচুর ফেরেশতাদল সহকারে দরুদ ও নামায আদায় করবেন। তারপর অবশিষ্ট সকল ফেরেশতাগণ। অতঃপর তোমরা নামায আদায় করবে—পালাক্রমে দলবদ্ধ হয়ে তোমরা আমার প্রতি দরুদ ও সালাম পড়বে, এ সময় কান্নাকাটি ও চিৎকার করে আমাকে কষ্ট দিও না। সর্বপ্রথম তোমাদের ইমামও আমার পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়গণ নামায পড়বে, তারপর মহিলাগণ এবং সর্বশেষে বালকেরা নামায পড়বে। আরজ করলেন : আপনাকে কবরে কে স্থাপন করবে? তিনি বললেন : আমার আহলে বাইতের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়গণ। তাদের সঙ্গে থাকবেন বিপুলসংখ্যক ফেরেশতা, যাদেরকে তোমরা দেখবে না ; অথচ তারা তোমাদেরকে দেখবেন। এখন উঠ, আমার পক্ষ থেকে উম্মতের পরবর্তীদের নিকট দ্বীন পৌঁছিয়ে দাও।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের দিনটিতে শুরুভাগে যথেষ্ট আরাম বোধ করছিলেন। লোকেরা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কাজ-কর্মে মগ্ন হয়ে যায়। নবীজী তাঁর বিবিগণের সেবা-শুশ্রূষায় ছিলেন। আমরা এরূপ আনন্দিত ; যা ইতিপূর্বে আর হই নাই। এরই মধ্যে অকস্মাৎ হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই স্ত্রীলোকেরাই অপেক্ষমান ফেরেশতার গৃহে প্রবেশে বাধা হয়ে রয়েছে ; এ ফেরেশতা আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। এ কথা শুনে সকলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল ; কেবল আমিই রয়ে গেলাম। হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক ছিল আমার কোলের উপর। ফেরেশতা গৃহে প্রবেশ করার পর নবীজী উঠে বসলেন, আমি গৃহের এক কোণে চলে গেলাম। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবীজী ফেরেশতার সাথে একান্তে গোপন আলাপে মগ্ন রইলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং পুনরায় আপন শির মোবারক আমার কোলে

রাখলেন। অতঃপর অন্যান্য বিবিগণকে গৃহে প্রবেশের জন্য বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলান্নাহ্! ইনি কি হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন ? নবীজী বললেন : না, মালাকুল-মউত হযরত আজরাঈল (আঃ); তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার অনুমতি ছাড়া যেন গৃহে প্রবেশ না করি, এবং আপনি অনুমতি না দিলে যেন ফিরে যাই। আপনার অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ করেছি। আল্লাহ্ আমাকে আরও হুকুম করেছেন যে, আপনার অনুমতি ছাড়া যেন আপনার রূহ কবজ না করি; এখন আপনার কি হুকুম। নবীজী বললেন : বিরত হোন, এই সময়টা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর উপস্থিতির সময়।”

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : এহেন অবস্থায় আমরা হতবাক ছিলাম, কি করবো কি না করবো কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। কারও মুখে কোন কথা বেরুচ্ছিল না; দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তায় সকলেই ভারাক্রান্ত, আমাদের উপর বিরাট এক মুসীবত, ফলে সকলেই নির্বাক অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনয়ন করলেন এবং সালাম দিলেন। আমি তার আগমন ও কথা অনুভব করেছিলাম। উপস্থিত পরিবারবর্গ ও নিকট-আত্মীয়গণ বের হয়ে যাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনার অবস্থা এখন কেমন? যদিও তিনি সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত, কিন্তু আপনার মর্যাদা ও সন্মান বৃদ্ধি করার জন্য এবং সমস্ত মাখলুকাতের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন। সেইসঙ্গে আপনার উম্মতের মধ্যে এব প্রচলন ঘটানোও উদ্দেশ্য। হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি অসুস্থতায় কাতর হয়ে গেছি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন : আপনি সুসংবাদ নিন— আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সেই স্থানে শীঘ্রই পৌঁছাবেন, যে স্থানটিকে শুধু আপনার জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছেন। নবীজী বললেন : হে জিবরাঈল! মালাকুল-মউত অনুমতি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন; তিনি আমাকে আমার বিষয় জানিয়েছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : ইয়া রাসূলান্নাহ্!

আপনার পরওয়ারদিগার আপনার প্রতি উদ্গ্রীব; হযরত জিবরাঈল কি এ বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করেন নাই? আল্লাহ্ র কসম, আজ পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারও নিকট অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও তা করবেন না। কিন্তু আপনার পরওয়ারদিগার আপনার সন্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান। তিনি আপনার প্রতি উদ্গ্রীব। সুতরাং হযরত মালাকুল-মউত উপস্থিত হলে তাঁকে ফিরাবেন না। অতঃপর হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রীলোকদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন : হে ফাতেমা! আমার নিকটবর্তী হও। হযরত ফাতেমা অতি সন্নিকটবর্তী হলে নবীজী কানে কানে কি যেন এক গোপন কথা বললেন। নবী-তনয়া এরপর কাদতে লাগলেন; এমনকি তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। অতঃপর নবীজী তাঁকে পুনরায় নিকটবর্তী হতে বললেন। নবীজী তাঁর কানে কানে আর একটি গোপন কথা বললেন। এবার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) হেসে উঠলেন; এমনকি তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। আমরা এটা একটা আশ্চর্যকর বিষয় দেখলাম। পরবর্তীতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এর রহস্য খুলে বলেছেন যে, প্রথমবার নবীজী তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন বলে আমি কৈদেছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি জানান যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে বেহেশতে মিলিত হবো। এইজন্যই আমি হেসেছিলাম। অতঃপর নবীজী হযরত ফাতেমা যাহরা (রাযিঃ)-এর দুই পুত্রকে নিকটে এনে তাদেরকে চুম্বন করলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরও বলেন : অতঃপর হযরত মালাকুল-মউত তশরীফ আনয়ন করেন এবং সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবীজী তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। মালাকুল-মউত নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন : এবার আপনার কি মঞ্জী, বলুন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

الْحَقَّقَنِي بِرَبِّي الْآنَ

“পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্যে এখন আমাকে পৌঁছিয়ে দিন।”

তিনি বললেন : হাঁ, আজকের দিনেই তা হবে। আপনার পরওয়ারদিগার আপনার প্রতি উদ্গ্রীব। একমাত্র আপনি ব্যতীত বারবার আমি অন্য কারও

নিকট যাই নাই, এবং আপনি ছাড়া আর কারও নিকট আমি অনুমতির অপেক্ষাও করি নাই। তবে এখনও কিছু সময় বাকি আছে। এই বলে হযরত মালাকুল মউত বের হয়ে যান। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনমন করেন। নবীজীকে সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! দুনিয়াতে আমার এই সর্বশেষ অবতরণ, ওহী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ; সবকিছু গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে, দুনিয়ার জীবনও তার শেষ প্রাপ্তে। আপনার কাছে উপস্থিত হওয়াটাই দুনিয়াতে আমার কাজ ছিল ; অন্য কোন প্রয়োজন দুনিয়ার সাথে আমার আর নাই ; এখন আমি আমার স্থানেই অবস্থান করবো। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন—তখন এমন অবস্থা দেখা গেছে যে, কারও ক্ষমতা নাই যে, সামান্যতম টু শব্দটিও করবে, আর না সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কাউকে সংবাদ প্রেরণের কোন অবকাশ ছিল। সুতরাং আমরা যা শুনছিলাম ও অনুভব করছিলাম, তা শুনে ও অনুভব করেই রয়ে গেলাম ; আর আমাদের হৃদয়ে ছিল তখন ভয় আর দুঃখ।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক আমার কোলে রাখার জন্য আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। এক পর্যায়ে তিনি বেঁহশ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর চেহারা এতো বেশী ঘর্মাক্ত হয়ে গেল যে, এরূপ ঘর্মাক্ত হতে আমি আর কাউকে দেখি নাই। আমি তাঁর চেহারা হতে ঘাম মুছতে লাগলাম। তখন এতে আমি এমন খোশবু অনুভব করলাম যে, এরচেয়ে উত্তম খোশবু আমি কোনদিন আর কোথাও পায় নাই। নবীজীর চৈতন্য ফিরে আসলে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুবরান হোন—আপনার চেহারা মোবারক প্রচুর ঘামাচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! ঈমানদারের জান ঘাম দিয়েই বের হয়, আর কাফেরের জান চোয়াল দিয়েই বের হয় ; যেমন গাধার জান বের হয়ে থাকে। এ কথা শুনে আমরা কৈপে উঠলাম। অতঃপর অন্যান্যদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর প্রেরণ করলাম। সর্বপ্রথম আমার ভাই উপস্থিত হলেন ; তাকে আমার পিতা আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি উপস্থিত হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়। এমনিভাবে

অন্যান্যরাও হযুরের ওফাতের পরই উপস্থিত হলেন। এভাবে মৃত্যুর পূর্বে কারও উপস্থিত হতে না পারার তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার মজীতে এরূপ হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল ও মীকাদিল (আঃ) বন্ধুরূপে ছিলেন। যখন নবীজীর বেঁহশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তখন বলতেন :

الرَّفِيقَ الْأَعْلَى

“পরম প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্য চাই।”

যখন তিনি কিছুটা কথা বলার মত হলেন, তখন বললেন :

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ إِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ مُتَمَسِّكِينَ مَا صَلَّيْتُمْ جَمِيعًا

“নামায, নামায ; তোমরা সকলে যতদিন নামাযের উপর দৃঢ় থাকবে, ততদিন তোমরা ধীন ও ঈমানের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকবে।”

এই নামাযের ওসীয়াত তিনি ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত এভাবে বারবার করতে থাকেন :

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ

“নামায, নামায।”

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় সোমবার দিন চাশত এবং দ্বিপ্রহরের মাঝামাঝি সময়ে।” হযরত ফাতেমা যাহরা (রাযিঃ) বলেন : “সোমবার দিনে আমি (হযুরের ইনতেকালে) যে শোক ও দুঃখের সম্মুখীন হয়েছি, এ দিনটিতে উম্মতের বড় বড় দুঃখ রয়েছে।” অথবা হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ) অনুরূপ উক্তি করেছিলেন, যেদিন হযরত আলী (রাযিঃ)—কে তীব্রবিক্র করে নিহত করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দিন লোকদের খুব বেশী ভীড় হয়ে যায় এবং কান্নাকাটির আওয়াজ আসতে লাগে, তখন ফেরেশতাগণ আমার কাশড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ দেখা দিল।

কেউ বললেন, হযূরের ওফাত হয় নাই। দুঃখ ও বেদনায় কারও কারও যবান বন্ধ হয়ে গেল ; অনেক দেহীতে কথা বলতে পারলেন। বিভিন্ন ধরণের অবস্থা তাদের উপর ছেয়ে আসলো। হযরত উমর (রাযিঃ) হযূরের মৃত্যুকে অস্বীকার করছিলেন। (দুঃখ ও বেদনায় কাতর হয়ে এমন হয়েছিল)। হযরত আলী (রাযিঃ) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন। হযরত উসমান (রাযিঃ) কথা বলতে অপারগ হয়ে গেলেন। কেবল হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত আকবাস (রাযিঃ)-এর অবস্থা আপন নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু লোকেরা হযরত আবু বকরের কথায় কর্ণপাত করছিল না। অবশেষে হযরত আকবাস (রাযিঃ) তশরীফ এনে বললেন :

وَاللّٰهُ اَتَذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ ذَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتَ وَلَقَدْ قَالَ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ قَمِيئُونَ ۚ تَرَانِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝

“একমাত্র মা’বুদ মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের কসম, নিঃসন্দেহে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করেছেন। তিনি নিজেই যখন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, তখন এ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন : “হে নবী ! আপনাকেও মরতে হবে, এবং তারাও মরবেই। তারপর কিয়ামত-দিবসে তোমরা স্বীয় পরওয়ারদিগার-সমীপে মোকদ্দমা পেশ করবে।” (যুমার : ৩১)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নবীজীর ওফাতের সময় বনী হারস ইবনে খায়রাজের নিকট ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির হলেন, অপলক নেত্র নবীজীর মোবারক চেহারাখানির প্রতি তাকিয়ে রইলেন এবং কপালে চুম্বন করে বললেন :

يَا بَنِيَّ أَنْتَ وَآمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيقَكَ الْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ

فَقَدَّ وَاللّٰهُ تَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন ; আল্লাহ্ তা’আলা আপনাকে দু’ বার মৃত্যু আশ্বাদন করাবেন না। অবশ্যই অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেছে।”

অতঃপর তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে সমবেত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۚ الْآيَةُ

“ভাইসব ! তোমরা যারা রাসূলুল্লাহ্ র ইবাদত করেছো, তাদের জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছে জানবে। আর যারা আল্লাহ্ তা’আলার ইবাদত করেছো, তারা জেনে রাখ— আল্লাহ্ জীবিত এবং কখনও তাঁর মৃত্যু হবে না। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা নিহত হোন, তবে কি তোমরা পিছনের (পূর্বমতের) দিকে ফিরে যাবে।” (আলি-ইমরান : ১৪৪)

লোকদের অবস্থা এই হলো যে, তারা আজকেই যেন প্রথম এ আয়াত শ্রবণ করলেন।

এক রেওয়াযাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সংবাদ পাওয়া মাত্রই এসে হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি দরদ শরীফ পড়ছিলেন আর হৈচকি নিয়ে কাঁদছিলেন। তার চোখ বেয়ে ভরা কলসী থেকে ঢালা পানির ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তায় পর্বতশম

মজবুত ছিলেন। নবীজীর মোবারক চেহারার উপর থেকে আবরণখানি তুলে তাঁর কপাল চুম্বন করলেন, চেহারায হাত বুলালেন আর কাঁদতে কাঁদতে বললেন : আপনার উপর আমার মা-বাপ, পরিবার-পরিজন ও আমার জ্ঞান কুরবান, আপনি জীবনে-মরণে সর্বাবস্থায় আনন্দময় রয়েছেন। আপনার ওফাতের পর ওহীর ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, যা ইতিপূর্বে আর কোন নবীর বেলায় হয় নাই। আপনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী, কাঁদাকাটির বহু উর্ধ্বে রয়েছেন আপনি। আপনি নিজ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য গুণেই সুখী, শান্ত ও সংরক্ষিত রয়েছেন ; এমনকি আপনার পূর্বাপর অবস্থা আমাদের কাছে একই রয়েছে। যদি মৃত্যু আপনার কাঙ্ক্ষিত ও পছন্দনীয় না হতো, তবে আপনার বিচ্ছেদে আমরা প্রাণ দিয়ে দিতাম, যদি আপনি আমাদেরকে কাঁদতে নিষেধ না করতেন, তবে আমরা আপনার জন্য অশ্রুর ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিতাম, আর যে বিষয়টি আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে অর্থাৎ বিচ্ছেদ-বেদনা ; তা অবশ্যই থেকে যাবে ; কোনদিন ভুলা যাবে না। আয় আল্লাহ্ ! আমাদের এ কথাগুলো আপনার হাবীবের কাছে পৌছিয়ে দাও। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের স্মরণ করুন, আপনি নিজেও আমাদেরকে স্মরণ করুন। আপনি যদি আমাদেরকে ধৈর্য ও স্থিরতার শিক্ষা না দিতেন, তাহলে এই ব্যথা ও বেদনায় আমাদের কেউ দাঁড়াতে পারতো না। আয় আল্লাহ্ ! আপনার নবীর কাছে আমাদের এ আজীগুলো পৌছিয়ে দিন এবং আমাদেরকে নেক আমলের তওফীক দিন।

هَذَا اخْرَمَا اَقْدَرَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَجَذَبَ قُلُوبَنَا اِلَيْهِ لِيَكُونَ لَنَا  
بِرَسُولِ اللهِ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَنَرْجُو مِنَ اللهِ اَنْ يَبْدِلَ السَّيِّئَةَ  
بِالْحَسَنَةِ وَاَنْ يَدْخِقَنَا بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ عَلَى الْاِيْمَانِ اِنَّهُ اَكْرَمُ مَسْئُولٍ وَاَعَزُّ  
مَأْمُولٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

[ মুকাশাফাতুল কুলুব পূর্ণ সমাপ্ত ]